রোকেয়ার মননে পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণ ও বর্জনের অভিঘাত

এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

রোকেয়ার জীবদ্দশায় বাংলা ছিলো ঔপনিবেশিক শাসনাধীন। ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের, তথা পশ্চিমের, ব্যবসায়িক যোগাযোগের সূত্র ধরে এ এলাকা হয়ে ওঠেছে তাদের ঔপনিবেশিক অধিভূমি। ঔপনিবেশিকতার দোহাই দিয়ে ইউরোপ আমাদের মননে, ভাবনায়, জ্ঞানে ও শিক্ষায় অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলো। এই অভিঘাত, প্রথমত, আমাদের চিরায়ত সাংস্কৃতিক কাঠামোর ধারা ভেঙে দেয়; দ্বিতীয়ত, অধিগ্রহণ করে নেয় আমাদের মনোজগৎ ও ভূমি। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় ভারতবর্ষের শিক্ষা ও অগ্রগতি। মুসলিম নারীকেও বঞ্চনার এই উত্তরাধিকার বহন করতে হয়। বঞ্চিত নারীর শিক্ষার বিকাশে প্রাণাধিক চেষ্টা করেন রোকেয়া সাখাওয়াৎ (১৮৮০-১৯৩২)। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেশজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনার বহুমুখী ধারার সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। পরিচয়ের সূত্র ধরে নিজস্ব চিন্তাবিশ্ব নির্মাণে ইউরোপীয় প্রভাবকে যেমন তিনি কাজে লাগান, তেমনি নির্বিচারে ইউরোপকে গ্রহণ করার ভাবনাও প্রত্যাখ্যান করেন। রোকেয়ার চিন্তাবিশ্ব নির্মাণে এই দুটি দিক উপস্থাপন করার প্রয়াস নেওয়া হবে বর্তমান নিবন্ধে। এই বোধ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে রোকেয়া পাশ্চাত্য চিন্তাকে কতোটুকু গ্রহণ করেছেন, আর কতোটুকু বর্জন করেছেন — উভয়ই — গুরুত্ব পাবে উক্ত আলোচনায়।

দুই

পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার সঙ্গে ভারতীয় চিরায়ত ভাবনার মেলবন্ধন যেমন রয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য রুচি ও সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করার দৃষ্টান্তও লক্ষ করা যায় এ অঞ্চলের চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে। প্রত্যাখ্যানের মধ্যে রয়েছে পাশ্চাত্য উপযোগবাদী দর্শন, তথা বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানও। সামাজিক প্রগতি ও যুক্তিবাদের দিশারী তাত্ত্বিকগণ হলেন — ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত। পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রত্যাখ্যানের প্রতি বিচক্ষণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় রোকেয়ার প্রতিবাদী কর্ম ও

* **ড. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া :** প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষাচিন্তায়। পশ্চিমের অনেক ভাবনা রয়েছে, যা কল্যাণ ও শুভজীবনের পাথেয়, সেসব চিন্তার প্রতি রোকেয়ার আগ্রহ ও অনুগ্রহ — দুই-ই — ছিলো।

রোকেয়ার চিন্তায় জীবনসংগ্রাম ও সাহিত্যভাবনার বহুমুখী দিক উন্মোচিত হয়েছে। লক্ষ্যগত দিক থেকে এসবকিছুকে আমরা দুটি মোটা দাগে আলোচনা করতে পারি : প্রথমত, রোকেয়া নারীর জন্য শিক্ষা-উপযোগী পরিবেশ প্রত্যাশা করেছেন, দ্বিতীয়ত, তিনি নারীমুক্তির অনুষঙ্গ হিসেবে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছেন। শিক্ষা বিস্তারে তিনি চেষ্টা করেছেন লোকজ, দেশজ ও প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিকে মানানসই করে উপস্থাপন করতে। নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা — উভয়ই — অনুসন্ধান করেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস, রম্য রচনা ও প্রবন্ধে। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে রোকেয়া অনুসন্ধান করেছেন পুরুষতান্ত্রিকতা। অনুসন্ধান করেছেন নারীর প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতিবাচক ভাবনার উৎসসমূহ। তাঁর ভাবনায় ছিলো স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, অন্যভাবে বলা যায় — ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। সর্বোপরি, বাংলার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ে রোকেয়া অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এই অভিঘাতের উৎসে ছিলো সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য সৃষ্টি করা।

নারীর জন্য শিক্ষা, নারীর ভোটাধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, সামাজিক ও আইনীয় পরিসরে তাদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা— এই ছিলো তাঁর জীবন ও সংগ্রামের ক্ষেত্র। জীবনসংগ্রামের ভেতর দিয়ে রোকেয়া নির্মাণ করেছেন তাঁর জীবনবোধ ও দর্শন। এই জীবনবোধ ও আদর্শের শর্তকে বিবেচনায় রেখে যদি রোকেয়াকে মূল্যায়ন করতে সচেষ্ট হই, তাহলে তাঁর লেখায় দুটি মাত্রা লক্ষ করব : প্রথমত, তিনি স্বজাতীয়তার ভেতর খুঁজেছেন আত্মপরিচয়ের উপাদান; দ্বিতীয়ত, তাঁর সময়ে ইউরোপের, তথা বহির্বিশ্বের যে জ্ঞান ও ধারণার বিকাশ ঘটেছে, সেসব ধারণাকে বাছ-বিচার করে গ্রহণ করার বিচক্ষণতা। এর অর্থ হলো — রোকেয়া ইউরোপকে গ্রহণ করেছেন বিচক্ষণতার সাথে, বর্জনও করেছেন বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পাণ্ডিত্যের সাথে। বর্তমান প্রবন্ধের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এসব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে।

তিন

রোকেয়ার ধারণাগত অবস্থান ও পাশ্চাত্য ভাবনা

পাশ্চাত্যের, কিংবা ভারতবর্ষের কোনো চিন্তক দ্বারা রোকেয়া কি প্রভাবিত ছিলেন? রোকেয়া তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, কিংবা, উপন্যাসের কোথাও এ-রকমটি বলেননি যে, তিনি নির্দিষ্ট কোনো দার্শনিক বা চিন্তাবিদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে, তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে পাশ্চাত্য, তথা পশ্চিমা সূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গের সূত্রে আমরা তাঁর 'সৌরজগৎ', 'স্ত্রী জাতির অবনতি', 'জ্ঞানফল', 'নারীসৃষ্টি', 'শিশু-পালন', 'মুক্তিফল',

'সৃষ্টিতত্ত্ব' ও 'ডেলসিয়া হত্যা' প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে এ প্রভাবের একটি উৎস বের করতে সক্ষম হব।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, রাষ্ট্রচিন্তা ও যুক্তিবাদিতার প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ করি 'সৌরজগৎ' (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৭৯-৮২) শীর্ষক প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধের মূল কথা হলো— সমাজ ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে 'সামাজিক সৌর পরিবার', আর নারী ও পুরুষ — এরা হলো— সমাজ নামক সৌরজগতের গ্রহ। প্রত্যেক গ্রহ তার নিজ কক্ষপথে চলে, অথচ এরা কক্ষচ্যুত হলে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজও তেমনি এক প্রপঞ্চ, তাই সামাজিক জীবনকে তিনি তুলনা করেছেন সৌরজগতের সঙ্গে। রোকেয়া সৌরজগতের ধারণার সাহায্যে 'সমাজ' বিষয়ক ধারণাকে ব্যবহার করার পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজকে সৌরজগতের সঙ্গে এই তুলনার মধ্যে আমরা দুটি বিষয় মিলিয়ে দেখতে পারি :

প্রথমত, 'সৌরজগৎ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি গ্রহ ও সৌরজগতের ধারণা নিয়েছেন রূপক অর্থে। সৌরজগতের সদস্যদের মধ্যে যেমন রয়েছে আন্তঃসম্পর্ক, তেমনি মানব সমাজের মধ্যেও এই আন্তঃসম্পর্ক সক্রিয় থাকতে হয়। গ্রহসমূহের সঙ্গে সূর্য একটি ভারসাম্য বজায় রাখে, সামাজিক জীবনেও এই ভারসাম্যের প্রয়োজন রয়েছে। রোকেয়ার মতে, ভারসাম্যহীন সমাজ পরিণত হয় সংঘাত, বৈষম্য ও বঞ্চনার সূতিকাগারে। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের জন্য প্রয়োজন ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী। ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর এই অমোঘ সম্পর্ককে রোকেয়া উপস্থাপন করেছেন সৌরজগত ধারণার সাহায্যে। তাঁর সৌরজগত ধারণায় আমরা খুঁজে পাই ফরাসি বিপ্লবের প্রচ্ছায়া। রোকেয়ার সময়কাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। আঠার শতকের শেষের দিকে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান নিয়ে ফরাসি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন দার্শনিকরা। সেই আহ্বানের ডাক ভারতবাসী শুনতে পেয়েছেন আরো অনেক পরে। এর মানে হলো ফরাসি বিপ্লবের অভিঘাত ভারতবর্ষে পরোক্ষভাবে হলেও প্রভাব ফেলেছিল। রোকেয়া সেই প্রভাবকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের আহ্বান ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক সংঘ প্রতিষ্ঠার। রোকেয়ার চিন্তায় এই আহ্বান হয়তো দাগ কেটেছিলো, তারই প্রভাবে তিনি সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার অমোঘ বাণী নতুন করে শুনিয়েছেন ভারতবাসী নারীকে।

ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক পাঠকের নিকট উপস্থাপন করা যেতে পারে : এক. ফরাসি বিপ্লবের একটি দার্শনিক লক্ষ্য ছিলো, যার ওপর দাঁড়িয়ে নারী কৌতূহলী হয়ে বাস্তিল দুর্গে আনন্দের মিছিলে সমবেত হয়েছিলো। স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, খাদ্যের দাবি ও মানসিকভাবে সমৃদ্ধ সময় কাটানোর অভিপ্রায় ছিলো এই বিপ্লবের পেছনের কারণ (Lefebvre & Kates, 2001 [1930])। বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত নারী আন্দোলন করেছিলেন "রুটি ও গোলাপের" জন্য। ফরাসি বিপ্লবের বাণী ছিলো "মানুষ মাত্রই

সমান। আইন হলো সমষ্টির ইচ্ছা। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলো জনগণ।” বিপ্লবের এই মন্ত্র গোটা পৃথিবীর রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক পরিসরে নতুন ভাবনা নির্মাণে সাহায্য করে। ভারতের স্বাধীনতা ও উপনিবেশ-বিরোধী বলয়ে এ বিপ্লবের প্রভাব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। রোকেয়া হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকতে পারেন। এর প্রভাব আমরা লক্ষ করি তাঁর বিভিন্ন রচনায়। ‘সৌরজগৎ’ তেমনি এক রচনা।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি রোকেয়ার আগ্রহ ছিলো। সেটা নির্মোহ কি না, তা আলোচনার দাবি রাখে। তবে, রোকেয়ার লেখালেখির শুরু থেকে পাশ্চাত্যের, তথা ইউরোপের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিলো। দেশের বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই আকর্ষণের প্রকাশ পায় তাঁর লেখা ‘সৌরজগৎ’ রচনায়। এই রচনায় গওহর ও জাফরের আলাপচারিতা লক্ষ করা যাক : “... সেদিন ইঁহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল!—সম্ভবতঃ পোর্ট আর্থার এবং বালটিক ফ্লীট জয় করিয়াও জাপানীদের তত উল্লাস হয় নাই!!” (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৮১)। এই বাক্য থেকে অনুধাবন করা যায় যে, বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংকটের বিষয়েও রোকেয়া মনোযোগী ছিলেন। রোকেয়ার রচনায় উল্লিখিত দুটি স্থানই মূলত জাপান-রাশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জয়-পরাজয়ের প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে।

‘সৌরজগৎ’— নাটিকার মতো করে উপস্থাপিত একটি ফিকশন। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে আলোচনা ও সংলাপ হলো এর উপজীব্য। রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উক্ত রচনায়। একইসঙ্গে পশ্চিম, তথা বহির্বিশ্ব সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানও স্থান পেয়েছে এখানে। আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষা-অনুরাগের বিষয়সমূহে পশ্চিমা দৃষ্টান্ত স্থান পেয়েছে তাঁর এ রচনায়। উক্ত রচনায় গওহর ও জাফরের মাঝে একটি সংলাপ লক্ষ করা যাক : “... হুঁ—কন্যাগুলি অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হইবে! সাধে কি তোমাদের সৌরজগৎ বলি। ...” (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৮২)। এখানে শিক্ষার তীর্থস্থান অক্সফোর্ডকে রোকেয়া গুরুত্বের সঙ্গে সামনে নিয়ে এসেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে অক্সফোর্ড ভূমিকা রেখে আসছে শত শত বছর ধরে। রোকেয়া অক্সফোর্ডের এই অবদানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয় বুঝায় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে রোকেয়ার ধারণা ছিলো। পরিচয় ছিলো তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে।

‘সৌরজগৎ’ শীর্ষক রচনায় পশ্চিমা শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতিও রোকেয়ার টান লক্ষ করা যায়। তাঁর বর্ণনা লক্ষ করা যাক : “...। কেবল ইংল্যান্ড কেন, আমেরিকা যাইবারও ইচ্ছা আছে,— ... ‘নায়েগারা ফলস’ দেখিতে চাহে” (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৮৪)। আবার পশ্চিমা পরিবেশ-প্রকৃতি উপভোগ করার আগ্রহ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত

করতে চাননি। উক্ত রচনার দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো বিজ্ঞান ও নারীবাদ। তিনি নারীবাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। নারীর প্রতি আমাদের শব্দ ব্যবহার, আচরণ ও মানসিকতার গতানুগতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিবাদ করেছেন সেখানে। যেমন, আমাদের প্রচলিত সামাজিক সংস্কৃতিতে বিদ্যমান অক্ষমতা, অসামর্থ্য ও ভয়-ভীতি থাকাকে মূল্যায়ন করা হয় নারীগত হিসেবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে থাকা এ ধারণা একান্তই পুরুষতান্ত্রিক অবস্থান থেকে গৃহীত। পুরুষতন্ত্রের পরিচর্যা ও অধীনে থাকা এ বদ্ধমূল ধারণার উল্লেখ করে একটি প্রিয়-প্রতিবাদ ও সংশোধন করেছেন রোকেয়া। 'সৌরজগৎ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গওহর ও জাফরের সংলাপটি উদ্ধৃত করা যাক :

> "গওহর।। তুমি পাথুরে পথকে ভয় কর, ঢালুপথে গড়াইতে চাও না,—ইহা তোমার womanishness (স্ত্রীভাব)।
> নূর। 'womanish' শব্দে আমি আপত্তি করি, 'ভীরুতা' 'কাপুরুষতা' বল না কেন?
> জাফ। পিপীলিকার পক্ষ হইলে শূন্যে উড়ে। স্ত্রীলোকে শিক্ষা পাইলে পুরুষদের কথার প্রতিবাদ করে,—সমালোচনা করে। তুমি কি গওহরকে ভাষা শিক্ষা দিবে?" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৮৭)।

'সৌরজগৎ' শীর্ষক রচনায় রোকেয়ার বিজ্ঞান প্রীতিও আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। এখানে তিনি রসায়ন, শব্দবিজ্ঞান, টেলিফোন, গ্রামোফোন ও ফনোগ্রাফের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এসব উল্লেখ্য থেকে বোঝা যায় যে, সে-সময়ের বিজ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। রচনায় তিনি যেসব স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন তা-ও ঐ পশ্চিমের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণেরই ইঙ্গিত বহন করে। আলোচনায় তিনি চিমনী সাইডের প্রসঙ্গও এনেছেন। সেখানেও তিনি পশ্চিমা দুনিয়ার কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি— "আবার সেদিন ডাউহিল ও ঈগেলস ক্রেগের সন্ধিস্থলে নামিয়াছিলাম" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৮৫)। এই নিবন্ধের বিভিন্ন বাক্যে পশ্চিমা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও স্থানের নামকরণের উল্লেখ মূলত তাঁর মননে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসঙ্গকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে অন্তত কয়েকটি নারীবাদী পরিপ্রেক্ষিত লক্ষ করা যায়। কাউকে অকর্মণ্য, অলস, কিংবা, ভীরু হিসেবে প্রতীয়মান করার জন্য 'স্ত্রীভাব' বা 'স্ত্রীজাতির মতো'—এসব শব্দ — ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে। নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করে উপস্থাপন করার ঐতিহ্যগত ধারাই এ-ধরনের শব্দ ব্যবহারের কারণ। উক্ত রচনার আরেকটি সংলাপ লক্ষ করা যাক : "নারী শিক্ষিত হইলে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয়ে পড়ে" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৮৭)। নূর, জাফর ও গওহরের মাঝে সংলাপে জাফরের শেষ কথা হলো — নারীকে শিক্ষিত করার প্রয়োজন নেই। এ

ধরনের প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাসী জাফর ও গওহর নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যে ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন, নূর তার প্রতিবাদ করেছেন। এর ভেতর দিয়ে আমরা রোকেয়ার মনন ও ভাবনার সাহসী ও অগ্রসর অবস্থানকে বুঝতে পারি। আবার এ ভাবনার পেছনে রোকেয়ার পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শনের প্রতি টানটিও টের পাই। রোকেয়া-সমালোচকেরাও এমনটি দাবি করেছেন। থারু ও ললিতা সেরকম সমালোচকদের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে বলছেন, “everything Indian is bad and everything Euro-American good.” (Tharu and Lalita, 1991: 342)। সমালোচকদের ভাষ্য মতে, পশ্চিমের প্রতি রোকেয়ার বিশেষ সহানুভূতি ও প্রীতি রয়েছে। এই প্রীতির কারণে তিনি পশ্চিমের সবকিছুকে শুভ ও ভালো মনে করছেন। আসলে কী তাই? পরবর্তী আলোচনায় এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস নেব।

ভাষা নির্মাণ ও সামাজিক সংস্কৃতির বলয়ের মধ্য দিয়ে যে নারী বিকশিত হয়েছে, সেখানে স্থান পেয়েছে নারীর অধঃস্তনতা। পশ্চিমা নারীবাদের বিকাশেও এ বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে আমরা এমনটিই লক্ষ করে আসছি। ভাষা প্রয়োগে পুরুষালি ও নারীবাচক পার্থক্য ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিবেচনা থেকেই অনুমোদিত। ভার্জিনিয়া উলফ-এর (Woolf, *1981 [1929]*) বিভিন্ন রচনায় আমরা এই অনুসন্ধানটি লক্ষ করি। উলফ বলছেন, নারী যখন লিখতে যায়, তার মতো করে সে কোনো ভাষা খুঁজে পায় না। সাধারণ কোনো বাক্য প্রস্তুত অবস্থায় সে পায় না, যা তার লেখায় ব্যবহার করতে পারে অনায়াসে। এর মানে হলো — ভাষাও লৈঙ্গিক রাজনীতির বলয়ে আটকা পড়ে আছে।

নারীর জন্য ভাষা নির্মাণের দাবি জোরালো হয় হেলেন সিক্সাসের দর্শনে (Cixous, 1975, [1976])। সমাজতাত্ত্বিক অবস্থান থেকে ভাষার লৈঙ্গিকীকরণ অনুসন্ধান করেছেন তিনি। সিক্সাসও মনে করেন যে, শব্দ প্রয়োগে যে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য রয়েছে, তা ভেঙে ফেলা জরুরি। এর বিকল্প হিসেবে তিনি প্রস্তাব করেন— নারীর স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম প্রয়াসই হওয়া উচিত নিজের জন্য ভাষা নির্মাণ করা। এর মাধ্যমে সম্ভব শব্দের ওপর যে পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব রয়েছে, তা ভেঙে ফেলা। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে **১৯৭৫** সালে প্রকাশিত তাঁর “The Laugh of the Medusa” শীর্ষক প্রবন্ধে হেলেন সিক্সাস ‘এক্রিচার ফেমিনিন’ (Cixous, 1976) ধারণাটি ব্যবহার করেন। নিজের মর্যাদা, নিজের জন্য উপযোগী ভাষা খোঁজা, নারী সম্পর্কিত ভাষার দ্যোতনায় সৃষ্টি করতে হবে নিজস্বতা। এই নিজস্বতার দাবিতেই প্রতিষ্ঠিত পুরুষতান্ত্রিক ভাষা ও ভাষাশৈলির নিয়মরীতি ভেঙ্গে নারীর জন্য ভাষার নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সৃষ্টির এই তাগিদ থেকে তিনি ‘এক্রিচার ফেমিনিন’ ধারণার প্রস্তাব করেন। এ রীতি অনুসারে, নিজেকে, নিজের অভিজ্ঞতা ও দেহকে পাঠ করার মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে লিখবে, তার নিজের জন্য ভাষা নির্মাণ করবে। অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নির্মিত হবে

নারীর ভাষা (*Marks and de Courtivron* : 256)।[১] ভাষা নির্মাণের এই প্রয়াস ও পাল্টা প্রয়াসের তর্কটি আমরা লক্ষ করি নূর, জাফর ও গওহরের সংলাপে। গওহর ও জাফর প্রথাবাদী। নারীকে প্রথার অচলায়তনে বেঁধে রাখতে চায় গওহর।

রোকেয়ার মাঝে পাশ্চাত্য চিন্তা নানান ভাবে প্রভাব ফেলেছে। 'সৌরজগৎ' শীর্ষক রচনার প্রসঙ্গটি আবারো উল্লেখ করতে পারি। পূর্বে উল্লেখ করছি যে, ইউরোপীয় বিজ্ঞান, নবজাগরণ ও চিন্তার বহুমুখী প্রভাব রয়েছে এ রচনায়। এ রচনার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের একজন হলো জাফর, যিনি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিনিধি। জাফর ও গওহরকে দেখি কখনো সংশোধনকারীর ভূমিকায়, আবার কখনো-বা ক্রিটিকের ভূমিকায়। ক্রিটিক্যাল হবার প্রবণতাটি মূলত বিংশ শতাব্দীর চিন্তার বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে যুক্তি ও প্রতিযুক্তির এই ধারাটি পাশ্চাত্য যুক্তিপ্রবণতার একটি দিক। একে কখনো দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। আধুনিকতাবাদী হেগেল (Hegel, 1970 [1807]) যুক্তি প্রয়োগের এই কৌশলকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দেন তাঁর *Phenomenology of Spirit* শীর্ষক গ্রন্থে (Hegel, 1970)। রোকেয়ার বিভিন্ন প্রবন্ধে, কথিকায় ও উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে যুক্তিপ্রবণতার এই ধারাটি আমরা লক্ষ করি।

নারীর প্রতি আমাদের সামাজিক বোধের আরেকটি চিত্র ফুঠে উঠেছে 'সৌরজগৎ' শীর্ষক রচনায়। জাফর, গওহর ও নূরের মাঝে সংলাপটি লক্ষ করা যাক :

> জাফ। "স্ত্রীলোককে আমি কায়িক বলের শ্রেষ্ঠতা দিব না।"
> গও। কেন দিবে না? "Give the devil even his due"
> জাফ। "কিন্তু আমি রমণীকে তাহার প্রাপ্য স্বত্ব দিতে অক্ষম।"
> (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৯৩)।

এখানে লক্ষণীয় যে, জাফর পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করছেন। অন্য দিকে, গওহর ও নূরের বোধ-উপলব্ধি অবতীর্ণ হয়েছে সৃষ্টিকারী চরিত্রের প্রতিফলন হিসেবে। জাফর যেখানে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে অপারগতা প্রকাশ করছেন, সেখানে যার যা প্রাপ্য তা বুঝিয়ে দেবার পক্ষে মত দিচ্ছেন নূর। যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি— এর মধ্য দিয়ে রোকেয়া তাঁর দাবির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। আলোচনার এই পদ্ধতিটি সক্রেটিক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। আর, তাঁর চিন্তার সীমারেখা পার হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার গোটা প্রক্রিয়ায় একটি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণেরও প্রবণতা পাই। প্রবণতার এই ধারাটি পাশ্চাত্যের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচয়ের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। একদিকে

---

১. "women must write through their bodies, they must invent the impregnable language that will wreck partitions, classes, and rhetoric, regulations and codes, they must submerge, cut through, get beyond the ultimate reserve–discourse." (*Marks and de Courtivron* : 256)

সমতার আহ্বান, অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক ভাষার বিপরীতে নারীর জন্য ভাষারীতির দাবি রোকেয়ার পাশ্চাত্য নারীবাদী তাত্ত্বিকদের সঙ্গে পরিচয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, নারীকে নিয়ে বিদ্যমান যে সংস্কার রয়েছে, রোকেয়া তাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। চ্যালেঞ্জের এই ক্ষেত্রটি আমরা লক্ষ করি আঠার শতকের পাশ্চাত্য নারীবাদী ঘরানায়। বিশেষ করে নারীর শিক্ষা ও মর্যাদার প্রশ্নে ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট (Wollstonecraft, 1978 [1992]) ও সামাজিক সমতাবিচারের অবস্থান থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল (Mill, 2012 (1869)) এ কাজটি করেছেন। রোকেয়ার ভাবনায় পাশ্চাত্য এসব চিন্তকদের দার্শনিক উপকরণ ও প্রভাব লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি, রোকেয়ার চেতনা নির্মাণের পেছনে রয়েছে পাশ্চাত্য ভাবনার গতিধারা। তাঁর 'সৌরজগৎ' শীর্ষক প্রবন্ধের সংলাপ, মত ও বিরুদ্ধ মত উপস্থাপনের ধারাটিতে একদিকে যেমন রয়েছে সক্রেটিক ডায়াল্যাক্টিকেল মেথডের অনুসরণ, অন্যদিকে এর বিষয়বস্তুতে রয়েছে পাশ্চাত্য নারীবাদের আর্তি ও জাগরণ।

চার

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে রোকেয়া

নারীর আত্মপরিচয়ের উৎস কোথায়? কীভাবে খুঁজবে সে তার আত্মপরিচয়? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হলো রোকেয়ার চিন্তার অন্যতম প্রবণতা। তা করতে গিয়ে তিনি মানবচিন্তা, সাহিত্য ও দর্শনের মতো বিষয়াদি নিয়ে এসেছেন। সেখানে সক্রিয় ছিলো পাশ্চাত্য সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের অসংখ্য উপকরণ। *মতিচূর* [প্রথম খণ্ড] গ্রন্থের অন্তর্গত 'স্ত্রীজাতির অবনতি', 'নিরীহ বাঙ্গালী', 'অর্দ্ধাঙ্গী', 'সুগৃহিণী', 'বোরকা' ও 'গ্রহ' প্রবন্ধের নিবিড় পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁর আত্মপরিচয়ের ধারণাটি উপস্থাপন করতে পারি। এসব প্রবন্ধে নারীর সামাজিক অবনমন ও তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি অন্তত তিনটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন :

প্রথমত, তাঁর দাবি হলো— সুযোগের অভাবের কারণে নারী অবনতির শিকার হচ্ছে। সুযোগ না পেয়ে নারীকে অবসর নিতে হয়েছে তার কাজ হতে। ক্রমশ কর্মহীন নারী অক্ষম ও অকর্মণ্যে পরিণত হয়েছে। নারীর এ দুরবস্থার বর্ণনায় রোকেয়া বলছেন,

> "... কোনো এক অজ্ঞাত কারণবশতঃ মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানাবিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্ম্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১)।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার নারীর অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ভূমিকা রাখছে। মুসলমান নারীর জন্য এই সংকট আরো গভীর ও বিস্তৃত। বিশেষ করে পর্দা হলো সে সংকটের গভীরে অন্তর্নিহিত বাস্তবতা। বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির অভিভাষণের

চৌম্বক অংশ উদ্ধৃত করা যাক : "ভারতবর্ষের অবরোধ-প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। অবরোধ-প্রথা আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত।...।" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ২২৬)।

তৃতীয়ত, নারীকে কর্মহীন ও অদক্ষ করে রাখার সকল সামাজিক আয়োজনকে রোকেয়া নারী উন্নয়নের আরেক বাধা হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি দাবি করছেন যে, কর্মহীনতার ভেতর দিয়ে নারী হারিয়ে ফেলেছে তাঁর আত্মসম্মানবোধ। প্রকারান্তরে, তাঁরা হয়ে পড়ছে পুরুষের দাসী।

নারীর অধঃপতনের দায় ও কারণ রোকেয়া অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানে ইউরোপীয় চিন্তার প্রভাব তাঁর মননে আছে কি নেই, তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। যেমন, নারীর জন্য পর্দা প্রসঙ্গে আমাদের ভারতীয় মুসলিম সমাজের জিজ্ঞাসাটি হলো অনেকটা এ-রকম : "তবে কি আমরা ইংরাজদের অনুকরণে বিবিদের রাজপথে বেড়াইতে দিব? ..." (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ২২৬)। এ প্রশ্ন মূলত ভারতীয় মুসলিম কমিউনিটিতে ইংরেজদের জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। অগ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি নারীদের মধ্যে বিরাজ করুক, ভারতবর্ষের পুরুষ কর্তারা তা চাননি। আবার, বিলেতি জীবনাচরণের প্রতিও রোকেয়ার একটি টান আছে। এই টানের কারণে ইংরেজভীতির গণ-মনোভাবকে রোকেয়া ইতিবাচক হিসেবে দেখেননি। বিলেতি [ব্রিটিশ] সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রতি আমাদের তাচ্ছিল্যকে রোকেয়া শিক্ষা ও প্রগতির পক্ষে মনে করেননি। একই প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যটি উল্লেখ করা যাক :

> "৬০/৭০ বৎসর পূর্ব্বে পুরুষের পক্ষেও ইংরাজী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজী পড়িলেই লোকে কাফের হইত। এখন কর্ত্তারা তাহার ফলভোগ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, শক্তি, সামর্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিভাগের দ্বারই মুসলমানের জন্য "অযোগ্যতার অজুহাতে রুদ্ধ হইয়া আছে।...। মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন,—তাঁহারা যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিতা-মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা অযোগ্য মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা ত অতি স্বাভাবিক।" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ২২৬)।

পাশ্চাত্যের প্রতি অপার আগ্রহ ছিলো রোকেয়ার। এই আগ্রহ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলো পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অগগ্রতি দ্বারা প্রভাবিত হতে। বিলেতি সংস্কৃতি ও শিক্ষা যে শতগুণ এগিয়ে আছে, তা নিয়ে রোকেয়ার মাঝে আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা ছিলো। তবে, ইংরেজের সবকিছু যুক্তিহীনভাবে গ্রহণ করার পক্ষে কখনোই তিনি মত দেননি। আবার, নারীর স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রশ্নেও তিনি পশ্চিমা প্রভাবকে অগ্রাহ্য করেননি। সরাসরি না হলেও পশ্চিমা নারী স্বাধীনতা ও মানবমুক্তির নানান প্রসঙ্গের সঙ্গে যে রোকেয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে সহজে তা অনুধাবন করা যায়।

নারীর অবনতি ও নারীর অবরোধ প্রসঙ্গে রোকেয়ার বক্তব্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য নারীবাদী ঘরানার বিভিন্ন ধারার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রোকেয়ার জন্মের প্রায় একশো বছর আগে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট তাঁর *A Vindication of the Right of Woman* (Wollstonecraft, 1787) শীর্ষক গ্রন্থে একই প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন, ভিন্ন যুক্তিবিন্যাসে। সেখানে তিনি বলছেন, সমাজের প্রত্যেক স্তরে পুরুষ অপেক্ষা নারী কম সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সে কম সুযোগ পাচ্ছে। সুযোগের অভাবে পরিপূর্ণ বিকাশ হচ্ছে না নারীর। রোকেয়াও আহ্বান করছেন, "কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কায্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।" এখানে স্পষ্টতই রোকেয়ার মননে ওলস্টোনক্র্যাফ্ট এর প্রভাবের ইশারা পাওয়া যায়। এই ইশারার মূল কথা হলো—"...আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস, প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলনের অভাবে বারবার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ অঙ্কুরিতও হয় না" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১)।

নারীর অধঃপতনের কারণ হিসেবে পাঁচটি কারণের উল্লেখ পাই জাপান নিয়ে লেখা এইচ বি ট্রিসট্রাম (Tristram, 1895) এর *Japan : the Land of the Rising Sun* শীর্ষক গ্রন্থ থেকে। রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করেন। নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পাঁচটি অচ্ছুত ও দুরারোগ্য ব্যাধি হলো—"...indocility, discontent, slander, jeaslously and silliness… ."। লেখক এ প্রসঙ্গে আরো যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেন, তা হলো— "Although the Japanese wife is considered only the first servant of her husband." স্বামীর প্রধান সেবিকা হলেও পরিবারের সবাই তাকে 'সম্মানিত মহোদয়া' (honourable mistress) বলে ডাকে। জাপানে নারীর অবস্থার উন্নতির পেছনের কারণ হিসেবে রোকেয়া মনে করেন যে, পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও রীতিনীতির সঙ্গে জাপানীদের পরিচিত হওয়ার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। এই পরিচিতির কারণেই জাপানি নাগরিক নারীর অধঃস্তন অবস্থার উন্নতি প্রত্যাশা করে। রোকেয়ার গৃহীত ট্রিসট্রামের উদ্ধৃতি আমাদেরকে দুটি অনুসিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে :

এক. *Japan : the Land of the Rising Sun* শীর্ষক গ্রন্থের প্রতি রোকেয়ার আস্থা রয়েছে শতভাগ। এই আস্থার কারণ হিসেবে রয়েছে জাপানে নারীর অগ্রগতি ও নারীর প্রতি মর্যাদার মানোন্নয়ন, যা তারা অর্জন করেছে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে।

দুই. নারীর অবস্থা ও মর্যাদা উন্নয়নে জাপান কীভাবে সক্ষম হয়েছে? উল্লিখিত গ্রন্থের আলোকে রোকেয়া বলছেন, পাশ্চাত্য রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে।

সর্বোপরি, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ধারা ও মানবিক ভাবনার উন্নয়নের প্রতি তাঁর একটি নির্মোহ আকর্ষণ ছিলো। আচার-ব্যবহার, আদর্শ, বিজ্ঞান ও দৃষ্টান্ত বলতে তিনি পশ্চিমা

বিজ্ঞান ও জীবনাচরণকেই মনে করেছেন। পশ্চিমা নারীগণ তাঁর পিছিয়ে পড়ার সকল আয়োজনকে পরিহার করতে পেরেছেন। যেমন, নারীর সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অলঙ্কার পরার হিড়িক পশ্চিমা সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে ক্রমশ নাই হচ্ছে। নারীর সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অলঙ্কার পরিধানের সংস্কৃতিকে রোকেয়া প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। বিশেষ ক্লেদ নিয়ে তিনি যে মন্তব্য করছেন তা লক্ষ করা যাক : “বালা ও চূড়িগুলি বসিবার ঘরের পর্দ্দার কড়া (drawing room-এর curtain ring) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে” (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১৪)। অপ্রয়োজনীয়, অযাচিত দেহের বৃদ্ধি পাওয়া যেমন অস্বাভাবিকতাকে নির্দেশ করে, অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার পরিধানকে রোকেয়া সেরকমই মনে করেছেন। রোকেয়া তাঁর এই ভাবনায় অবস্থান নেবার জন্য যে কটাক্ষ ও রূপক শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে পাশ্চাত্য ভাবনার দুটি ধারণাগত উপকরণ উপস্থিত রয়েছে :

এক. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অশেষ আস্থা প্রকাশ পেয়েছে,

দুই. বাঙালি গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতিতে ড্রয়িং-রুম, পর্দার জন্য ‘পর্দার কড়া’ — এসব — রোকেয়ার সময়ে বহুলভাবে প্রচলিত হয়ে ওঠেনি। আমাদের গ্রামীণ জীবনে তখনও ‘বাঙলা ঘর’, কিংবা ‘বৈঠকখানা’, কিংবা, ‘অতিথি ঘর’ বহুল ব্যবহৃত শব্দ। পাশ্চাত্য সমাজে ঘরসাজে বহুল ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহার তার প্রতি অনুরাগেরই প্রকাশ।

পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে রোকেয়া আধুনিক মন ও মানসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। এই আধুনিকতার পরিচয় আরো স্পষ্ট হয়েছে কবি শেখ সা’দীর পোশাক নিয়ে বিবৃত নিষেধাজ্ঞায়। শেখ সা’দী বলতেন, “হে বীরগণ! (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীর পোষাক পরিও না।” (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১৪)। এর জবাবে রোকেয়া শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। যুদ্ধে শুধু পুরুষই জয়ী হয়নি। যুদ্ধে সফল বীর নারীদের কথাও বলেছেন। রোকেয়ার এই প্রচেষ্টাকে আমরা পিজানের নারী বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে তুলনা করতে পারি (ভূঁইয়া, ২০২১)। গীতিকবি ওভিদের বাঙ্ময় কাব্যময়তায় প্রকাশিত নারীর প্রতি অবহেলার প্রতিবাদ আমরা লক্ষ করি পিজানের নারী বিষয়ক রচনায় (ভূঁইয়া, ২০২১), তা-ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাঙালি চিন্তক রোকেয়া। কিন্তু, তাঁর ধারণা ও বক্তব্য উপস্থাপন করার সময় বহু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেন, আবার ও ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে চলমান ঐতিহ্যকে সমালোচনা করেছেন। এমনকী আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে অস্তিত্বশীল নারী-বিদ্বেষী শব্দের চরিত্র উন্মোচন করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে রোকেয়া পাশ্চাত্য রুচি ও আচরণের প্রতি সমীহ দেখিয়েছেন। যে পোশাক নিত্যদিনের কাজের বাঁধা তা পরিহার করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বোরকা নিয়ে তাঁর বক্তব্য সেরকম ইঙ্গিতই দেয়।

নবনূর পত্রিকার ১৩১১ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় ‘বোরকা’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে পর্দাপ্রথার প্রতি রোকেয়াকে কিছুটা নমণীয় মনে হয়েছে। এই নমণীয় ভাবটি

প্রদর্শন করতে গিয়েও তিনি পাশ্চাত্যের সঙ্গে [বিশেষ করে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে] তুলনা দাঁড় করিয়েছেন। পর্দা নিয়ে তিনি বিভিন্ন রচনায় ক্রিটিক্যাল অবস্থান নিয়েছেন। আবার পর্দার প্রতি উদাসীনতার প্রসঙ্গ আনতে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্যকে সমালোচনার লক্ষ করেছেন। রোকেয়ার এরকম বেশকিছু উদ্বৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে : "পৃথিবীর অসভ্য জাতীরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। ইতিহাসে জানা যায়, পূর্ব্বে অসভ্য বিট্রেনরা অর্দ্ধনগ্ন থাকিত।...। ক্রমে সভ্য হইয়া তাহারা পোষাক ব্যবহার করিতে শিখিয়েছে" (*রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, ২০০৬ : ৪৬)। পোশাকের সঙ্গে সভ্যতার একটি অনুষঙ্গ খুঁজেছেন রোকেয়া। এই অনুষঙ্গের সূত্রে তিনি মূলত বোরকাকে সভ্যতার পক্ষে ধরে নিয়েছেন, আর পোশাক-পরিচ্ছদহীন বৃটেনকে অসভ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। বোরকার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে পশ্চিমা ইংরেজের প্রসঙ্গই এসেছে : "কেহ কেহ বোরকা ভারী বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে ইংরাজ মহিলাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারী নহে" (*রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, ২০০৬ : ৪৬)।

পর্দা, কিংবা বোরকা নিয়ে পশ্চিমাদের প্রসঙ্গই বার বার রোকেয়া উল্লেখ করেছেন। কখনো পর্দার মাহাত্ম বর্ণনা করতে গিয়ে পশ্চিমা বে-পর্দাকে অসভ্য বলেছেন। আমরা যেন পর্দাপ্রথার প্রতি নেতিবাচক না হই, সেজন্য পশ্চিমাদের পরোক্ষ পর্দা-কালচারের দৃষ্টান্ত আনতেও ভুল করেননি। রোকেয়ার বক্তব্য লক্ষ করা যাক :

> "বর্ত্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন; তাঁহাদো পর্দা নাই কে বলে? তাঁহাদের শয়ন কক্ষে, এমনকি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিততে প্রবেশ করেন না। এ প্রথা কি দোষণীয়? অবশ্য নহে। কিন্তু এদেশের যে ভগ্নীরা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পর্দা ছাড়িয়েছেন, তাঁহাদের না আছে ইউরোপীয়দের মত শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র্য (bedroom privacy) না আছে আমাদের মত বোরকা।" (*রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, ২০০৬ : ৪৬-৪৭)।

রোকেয়ার বক্তব্যে স্ববিরোধিতা আছে। স্ববিরোধিতার একটি দিক হলো — প্রথমে তিনি ইউরোপকে পর্দাহীন বিবেচনা করে তাকে তাচ্ছিল্য করেছেন, অসভ্য হিসেবে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, ইউরোপের নারীর শয়নকক্ষেও তিনি স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পেয়েছেন, যা নারীর পর্দার মতোই এক নিরাপত্তা। এই স্ববিরোধিতার উর্ধ্বে রোকেয়ার বক্তব্যের মনোভাবটি হলো পর্দায় কোনো ক্ষতি নেই। এ অবস্থানটিকে পাকাপোক্ত করার জন্যই তিনি পাশ্চাত্যকে [বা ইউরোপকে] প্রসঙ্গ হিসেবে এনেছেন। এ প্রসঙ্গে কখনো তিনি পাশ্চাত্যের সমালোচনায় মুখর, আবার কখনোবা তাঁকে ইউরোপের পক্ষ নিতে হয়েছে। ইউরোপীয় মহিলাদের পোশাক নিয়ে রোকেয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাক :

> "ইংরাজী আদব কায়দা (etiquette) ও আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বরহিত (simple) পোষাক ব্যবহার করিবেন— বিশেষতঃ

> পদব্রজে ভ্রমণ কালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক-বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত নহে।" (*রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, ২০০৬ : ৪৭)।

আদব কায়দা ও পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে আমরা সাদামাটা হব, রোকেয়া এই দাবির পক্ষে ইংরেজ পোশাক-সংস্কৃতির আড়ম্বরহিত ভাবটি উল্লেখ করেছেন। তাতে করে ইউরোপীয় সংস্কৃতি পর্দা সমর্থন করে, তা বুঝা যায় না। পর্দা নিয়ে ইউরোপীয় প্রথার সমালোচনা করেছেন রোকেয়া। এ সমালোচনা কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক। প্রকারন্তরে, পর্দা নিয়ে তাদের বিরূপ মনোভাবের সমালোচনাও করেছেন। রোকেয়ার বক্তব্য লক্ষ করা যাক : "সময় সময় ইউরোপীয় ভগ্নীগণও বলিয়া থাকেন, "আপনি কেন পর্দা ছাড়েন না (why don't you break off purdah)?" কি জ্বালা! মানুষে নাকি পর্দা ছাড়িতে পারে?" (*রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, ২০০৬ : ৪৭)। এ হলো পর্দা নিয়ে ইউরোপীয় বোধের প্রতি রোকেয়ার কটাক্ষ। আবার পর্দার মানে নিয়ে তাঁদের অবস্থানের সমালোচনাও করেছেন এ প্রবন্ধে :

> " ইঁহাদের মতে পর্দা অর্থে কেবল অন্তঃপুরে থাকা বুঝায়। নচেৎ তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে তাঁহারা নিজেও পর্দার (অর্থাৎ privacy) হাত এড়াইতে পারেন না, তবে ওরূপ বলিতেন না। যদিও তাঁহাদের পোষকেও সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা হয় না, বিশেষতঃ সান্ধ্য-পরিধেয় (evening dress) ত নিতান্তই আপত্তিজনক।...।" (*রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, ২০০৬ : ৪৬-৪৭)

সর্বোপরি রোকেয়া পর্দার পক্ষেই মত দিয়েছেন। এ মতের পক্ষে তিনি দাবি করছেন যে, নারীর পোশাক ও সাজ-সজ্জায় ভারতবর্ষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের কোড ও ধারা মেনে চলতে হয়। এসব কোড আবার নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভাজন রেখা টানার কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নারীর কথা বলার ঢং, নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, নারীর খাদ্যগ্রহণের রীতিনীতি — এসবই — পুরুষ থেকে আলাদা— এই হলো নারীকে শনাক্ত করার অন্যান্য দিকের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নারীর জন্য আলাদা কোড, যা আবার নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। এসব ভেদরেখাকে রোকেয়া খারিজ করে দিয়ে বলছেন, পর্দা বা ড্রেসকোড বাঙালি মুসলিম নারীর পিছিয়ে থাকার অন্যান্য কারণ। লক্ষ করা যাক —

> "আমাদের [নারী] পোষাক পরিলে তাহাদের অপমান হয়! দেখা যাক সে পোষাকটা কি,—কাপড় তাঁহাদের ও আমাদের প্রায় একই প্রকার। একখণ্ড ধূতি ও একখণ্ড সাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুমাত্র তারতম্য আছে কি? যে দেশে পুরুষ পা-জামা পরে, সে দেশে নারীও পা-জামা পরে। "Ladies jacket" শুনা যায়, "Gentlemen's jacket ও শুনিতে পাই" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১৪)।

রোকেয়ার উপর্যুক্ত বক্তব্যে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় : প্রথমটি হলো— নারীর সঙ্গে পুরুষের পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য পোশাক কোনো মাধ্যম হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, প্রাত্যহিক পোশাকের পরিবর্তে পাশ্চাত্য নারীর পোশাক পরিধানের দৃষ্টান্ত নিয়ে এসেছেন রোকেয়া। এর অর্থ হলো — পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে পাশ্চাত্য রেওয়াজের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো। পোশাকের নাম ও ব্যবহারের প্রতি তাঁর আগ্রহ তা-ই প্রমাণ করে। পাশ্চাত্য জীবনাচরণ শেষতক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। রোকেয়াও এই ভাবনার উত্তরাধিকার হতে চেয়েছেন মাত্র।

রোকেয়ার লেখা 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে নারীর অবনতির কারণ অনুসন্ধান করার সময় যেসব ধারণা ও প্রয়াসের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে এসেছেন, সেখানে পাশ্চাত্য মোহাচ্ছন্নতার অনেক নজির পাওয়া যায়। যেমন, তিনি অগ্রগতি ও প্রগতির কথা বলতে গিয়ে এর প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছেন। এ প্রতিবন্ধকতা যেমন-তেমন করে অতিক্রম করা যায় না। এজন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়। অতিক্রমণের উৎস ও উদ্দীপনা জাগ্রত করার জন্য তিনি বিজ্ঞানী গ্যালিলিও'র দৃষ্টান্ত এনেছেন। বিজ্ঞানের নিখাদ সূত্রটি আবিষ্কার করতে গিয়ে তাঁকে যেমন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তেমনি ধর্মীয় বিধি-নিষেধের দেয়ালও অতিক্রম করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নটি খুবই গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন করে : "এ পোড়া সংসারে কোন্ ভালো কাজটি বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে?" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১৪)। এর সপক্ষে তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন— 'পৃথিবীর গতি আছে' — এই কথা বলাতে মহাত্মা গ্যালিলিওকে (Galileo) বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১৪)। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে দুটি বিষয় আমরা উল্লেখ করতে পারি :

এক. রোকেয়া পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নয়নের খোঁজ-খবর রাখতেন। গ্যালিলিও'র জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিবৃত তথ্য তাই প্রমাণ করে।

দুই. পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদেরকেও তিনি অনুকরণীয় হিসেবে সামনে রেখেছেন। এর বাস্তবসম্মত কিছু দৃষ্টান্ত পাই তাঁর পাশ্চাত্য ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থের পাঠ থেকে। মার্কিন ইতিহাসবিদ মিস ক্যাথরিন মেয়োর (Meyor, 1927) লেখা *Mother India* গ্রন্থটি তিনি পাঠ করেছেন। সেই গ্রন্থ থেকেও রোকেয়া জেনেছেন ভারতীয় হিন্দু নারীর দুঃখ ও দৈন্যের কথা। এই দুঃখ-দৈন্য জানার অভিজ্ঞানের আলোকে রোকেয়া ভারতমাতার মুসলিম ললনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে "... ভারতবর্ষে সেই মুসলিম-নারীর দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ২৩২)। রোকেয়ার আলোচনায় এসব ভাবনা ও তথ্যসূত্রের উপস্থিতি নির্দেশ করে যে, পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার সঙ্গে রোকেয়ার পরিচয় ছিলো।

পাশ্চাত্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন-ধারণা নিয়েও রোকেয়া কথা বলেছেন। তিনি খ্রিস্টধর্মের পাশ্চাত্য ধারার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। *জেনেসিস* গ্রন্থে বিবৃত আদম ও

হাওয়ার স্বর্গ থেকে পতনের গল্পকে তিনি সামনে এনেছেন ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসের অবস্থান থেকে। নেটিভ খ্রিস্টানরা মনে করতেন যে, "...রমণীর জ্ঞান-পিপাসাই মানবজাতির অধঃপাতের কারণ!" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১৮)। রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে *জেনেসিসের* এই সনাতন জ্ঞান থেকে ইউরোপ বের হয়ে এসেছে। আবার, ইউরোপীয় জনগণের মুক্তির ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো নারী। রোকেয়ার লেখা 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধের ৭নং ফুটনোট থেকে উল্লেখ করা যাক :

> "...ইউরোপীয় খৃষ্টানদের বিশ্বাস যে eve অভিশপ্তা হইয়াছিলেন; কিন্তু যীশুখৃষ্ট আসিয়া নারীজাতিকে সে অভিশাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "Through woman came curse and sin; and through women came blessing and salvation also."(*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬: ১৮)।

নারীর সক্ষমতা ও স্বাধীনতার প্রশ্নেও রোকেয়া ব্রিটিশ শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রভাবের মধ্যে মেরি ওলস্টেটক্র্যাফ্‌ট ও জন স্টয়ার্ট মিল এর কথা বলা যায় প্রাসঙ্গিকভাবে। নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বান আমরা লক্ষ করি মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট ও জন স্টুয়ার্ট মিল-এর চিন্তায়। *A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects* গ্রন্থে ওলস্টোনক্র্যাফট নারীর স্বাধীনতা, নারীর সক্ষমতা ও পুরুষের মতো তাঁরও শিক্ষা-দীক্ষা বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকের এই নারীবাদী ভাবনা রোকেয়াকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে সেই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে নিখুঁতভাবে। রোকেয়া তাঁর এই প্রবন্ধে স্বাধীনতাকে নারীর জন্য ন্যূনতম দাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১৮৬৯ সালে মিল লিখেছেন *The Subjection of Woman*। উক্ত গ্রন্থে মিল ইংল্যান্ডের বাস্তবতায় নারীর অধিকার ও বঞ্চনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, রাজনৈতিক অধিকার, আইনি অধিকার ও সামাজিক অধিকার ব্যতীত তাঁর উন্নতির কোনো সুযোগ নেই। রোকেয়া থেকে উদ্ধৃত করা যাক : "...একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও,—সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ২০)। নারীর সক্ষমতা নিয়েও রোকেয়া আশাবাদী ছিলেন। নারীবাদী ওলস্টোনক্র্যাফটও তাই ছিলেন। তাঁর অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে : (১) কী করিলে 'লুপ্ত রত্ন' উদ্ধার হবে? (২) কী করিলে "নারী দেশের উপযুক্ত কন্যা" হতে পারবে? আমরা লক্ষ করি যে, ওলস্টোনক্র্যাফট *A Vindication of the Rights of Woman* শীর্ষক গ্রন্থে এসব প্রশ্ন সামনে রেখে উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। রোকেয়ার এ প্রচেষ্টা দুটি অনুমানকে সামনে নিয়ে আসে : এক. রোকেয়ার ভাবনায় প্রাগ্রসর চিন্তার উপস্থিতি ছিলো, দুই.

'মহান ব্যক্তিরা একইভাবে চিন্তা করে'—এ দুটি অনুসিদ্ধান্তই রোকেয়ার ওপর আঠার শতকের পাশ্চাত্য নারীবাদের প্রভাবের বিষয়টি ইঙ্গিত করে।

পাঁচ

নারীর পর্দা ও পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া

পাশ্চাত্য নারী সম্পর্কে রোকেয়ার বর্ণনা ও মূল্যায়ন — দুটিই — লক্ষ করা যায় তাঁর লেখা 'সুগৃহিণী' শীর্ষক প্রবন্ধে। একজন নারী কীভাবে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হবেন, তা নিয়ে যেমন রোকেয়ার লেখা উপন্যাস ও প্রবন্ধে আলোচনা রয়েছে, তেমনি কীভাবে আমাদের প্রয়োজনে একজন নারী সুগৃহিণী হয়ে ওঠে, তারও বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে এখানে। পাশ্চাত্য নারীর মূল্য সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করছেন এভাবে —

> "The first point necessary to consider in the arrangement and ordering of a lady's household, is that everything should be on a scale exactly proportionate to her husband's income." (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৩৪)।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন-সংস্কৃতির নানান উপকরণ ও ভাবাদর্শ আমরা পাই রোকেয়ার বিভিন্ন রচনায়। তার এসব রচনার কেন্দ্রীয় বক্তব্য কিন্তু এক ও অভিন্ন : "নারী শুধু সুগৃহিণী হবার জন্য শিক্ষা অর্জন করবেন না।" ব্যক্তিত্বে, প্রজ্ঞায় ও কর্মে পুরুষের মতোই ভূমিকা রাখবে নারী। তবে ভূমিকা রাখার জন্য সুযোগের প্রয়োজন। এটুকু সুযোগ নারীর ন্যূনতম চাওয়া। এই প্রত্যাশা ও দাবির প্রেরণা রোকেয়া লাভ করেছেন পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা থেকে, যার ছাপ তাঁর এসব রচনায় পাওয়া যায়।

রোকেয়ার লেখা 'বোরকা' শীর্ষক প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতকে প্রাসঙ্গিক করার জন্যও তিনি ইউরোপের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, ইউরোপীয়দের সম্পর্কে বলতে গিয়ে রোকেয়া "সভ্যতাভিমানিনী (Civilized) ইউরোপীয়" শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। ব্রিটিশ নারীদের হ্যাট পরিধান নিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, "ইংরাজ মহিলাদের প্রকাণ্ড হ্যাট..." (রোকেয়া, ২০০৬ : ৪১)। ইউরোপীয়দের শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র্যের কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি তিনি: "ইউরোপীয়দের...শয়নকক্ষেরও স্বাতন্ত্র্য (bedroom privacy)" রয়েছে (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪১)। এ তো গেল ইউরোপীয়দের অন্দরমহল ও নারীর বেশ-ভূষা নিয়ে রোকেয়ার জ্ঞাত তথ্যাদি ও মন্তব্য। এর পাশাপাশি রোকেয়া ইংরেজদের রীতি-নীতি, আদর্শ ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন।

আমাদের নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে পশ্চিমা প্রতিক্রিয়ার বেশকিছু দৃষ্টান্ত তিনি সামনে এনেছেন। যেমন, রচনার কোনো এক জায়গায় উল্লেখ করছেন — "আপনি কেন পর্দা ছাড়েন না (why don't you break off purdah)"। ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদের

প্রতিক্রিয়ায় আমাদের নারীদের পর্যবেক্ষণও রোকেয়া উল্লেখ করেছেন, "...পদব্রজে ভ্রমণ কালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক-বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত নহে" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬: ৪১)। ইউরোপীয়রা যে পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করে, তাতে "সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা হয় না" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪১)। তাদের সান্ধ্য-পরিধেয় পোশাক সম্পর্কে রোকেয়া এমন মন্তব্য করেছেন — "সান্ধ্য-পরিধেয় (evening dess) তা নিতান্তই আপত্তিজনক" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪১)। নানান আঙ্গিকে, নানান রূপে রোকেয়ার চিন্তাবিশ্বে পাশ্চাত্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য রোকেয়ার ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে।

নারীদের ভীতু ও কোমল স্বভাবের বিষয়টি শুধু ভারতবর্ষের নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সারা পৃথিবীর নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এবিষয়টি তিনি নিবিড় অনুসন্ধানে আবিষ্কার করেছেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের তথ্যসূত্র থেকে। যেমন, কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় নিয়ে পুরুষের মধ্যে কোনো সংবেদনশীলতা নেই। কিন্তু, নারী সে ভারতীয় হোক, আর ইউরোপীয় হোক, এ যেন তাদের জীবনাচরণের নিত্যসঙ্গী। এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে তিনি জোনাথন সুইফট-এর লেখা *Gullivers' Travels* গ্রন্থের প্রসঙ্গ আনেন। বিশেষ এলাকায় ভ্রমণে থাকা গালিভার একজন ব্রবডিংঙ্গন্যাগের হাতে তুলে তার স্ত্রীকে দেখান। তার স্ত্রী দীর্ঘকায়; অথচ, ঐ ক্ষুদ্রকায় ব্রবডিংঙ্গন্যাগ দেখে ভয়ে চিৎকার দেয়। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার দেওয়া যেন নারীর স্বভাব। পশ্চিমা লেখকের গালিভার ট্রাভেলস গল্পের আলোকে রোকেয়া নারীর স্বভাবসুলভ আচরণের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানান মাত্রা ও ধারার সঙ্গে রোকেয়ার পরিচয় ছিলো। যেমন, তাঁর লেখা 'গৃহ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি গৃহের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি জন হাওয়ার্ড পেইন থেকে উদ্ধৃতি করছেন :

> "Home, sweet home;
> There is no place like home,
> Sweet Sweet home."

আমাদের জীবন-যাপনের উৎস যে গৃহ, সেরকম একটি গৃহের সন্ধান করেছেন রোকেয়া, যে গৃহ হবে একান্তই মধুরালয় অথবা, শান্তিনিকেতন। এ গৃহ নিজের মতো করে উপভোগ করার আলয়। 'হতভাগী নিরাশ্রয়ার' আশ্রয় যে গৃহ, সেই গৃহই তো সুইট হোম। শান্তি সৌহার্দের আলয় যে গৃহ, সেরকম এক শান্তিনিকেতনকে বোঝানোর জন্য রোকেয়া ইউরোপীয় গীতিকারের সেই কথা ধার করেছেন "Home, sweet home; /There is no place like home"। এসব দৃষ্টান্ত, উপমা ও বোধবুদ্ধির ব্যবহারে তিনি পাশ্চাত্য ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর করেছেন। এর অর্থ হলো রোকেয়ার মনন ও জ্ঞানে পাশ্চাত্য ছিলো। তবে পাশ্চাত্যকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেননি।

রোকেয়া-সমালোচকদের অনেকেই তাঁর ওপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বলেছেন। '*মতিচূর* গ্রন্থ সমালোচনা' প্রবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার রোকেয়ার ওপর পাশ্চাত্য প্রভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইঙ্গিতের আভাসসমূহ লক্ষ করা যাক : এক. মজুমদার প্রসঙ্গক্রমে রোকেয়ার *মতিচূর : প্রথম খণ্ডের* 'গৃহ' প্রবন্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। সাধারণত গৃহের অর্থ বলতে রোকেয়া বুঝেছেন : "গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়— যেখানে দিবাশেষ গৃহী কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪৫)। রোকেয়া গৃহকে ইংরেজ কবির ভাষায় 'সুইট হোম' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হোম সম্পর্কে রোকেয়ার যে ভাবনা, তা সম্পর্কে মজুমদারের মন্তব্য হলো : "পাশ্চাত্য দেশেও সুগৃহের ইহাই প্রকৃত আদর্শ চিত্র।" (মজুমদার, ২০০১ : ৫৬১)।

দুই. গৃহের ধারণা নিয়ে রোকেয়ার ভাবনায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পাশ্চাত্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। যেমন, রোকেয়া তাঁর 'গৃহ' শীর্ষক প্রবন্ধে নারীর গৃহ থাকা নিয়ে দাবি করছেন 'পুরুষের গৃহই স্ত্রীর গৃহ, স্ত্রীর স্বতন্ত্র গৃহ নাই।' এ হলো রোকেয়ার শ্লেষাত্মক মন্তব্য। তিনি নারীর জন্য স্বতন্ত্র গৃহের প্রত্যাশা করেছেন। যদিও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রোকেয়ার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বলছেন, নারী অথবা পুরুষ যে কারো একজনের গৃহ নাই-বা থাকতে পারে। কারণ আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে পিতৃগত কুল অনুসারেই গৃহের ঠিকানা হয়ে থাকে। "স্ত্রী এবং পুরুষের স্বতন্ত্র গৃহ হইলে সমাজ-বন্ধনে শিথিলতা আসিত" (মজুমদার, ২০০১ : ৫৬১)। কিন্তু, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের মতো নয়। 'গৃহ' ধারণা সম্পর্কে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পাশ্চাত্যের প্রসঙ্গ উল্লেখসাপেক্ষে বলেন, "পাশ্চাত্যদেশে অনেকেরই গৃহ নাই; পিতা আসিয়া পুত্রের আবাসে ভোজন করিয়া গেলে 'বিল' পরিশোধ করিতে হয়" (মজুমদার, ২০০১ :৫৬১)। মজুমদারের এই বক্তব্যে গৃহ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভাবনার দেউলিয়াত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। এই দেউলিয়া 'গৃহভাবনা' আমাদের জন্য কতোটা উপযোগী, তাও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

ছয়

রোকেয়ার ভাবনায় ব্রিটিশ [পাশ্চাত্য] প্রভাব ও অনাস্থা

রোকেয়ার কর্ম ও চিন্তায় কোথাও ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতি সমর্থন ছিলো না। তবে, ব্রিটিশদের অনেক অবদানকে তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রহণ ও বর্জনের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। এ-রকম অসংখ্য নমুনা ও দৃষ্টান্ত তাঁর লেখায় রয়েছে। তাঁর শিক্ষা আন্দোলন কর্মসূচিতে ইংল্যান্ডের শিক্ষাভাবনার প্রভাব ছিলো। তবে, তাদের শিক্ষাচিন্তা যে বিচ্যুতিমুক্ত, রোকেয়া কখনোই সেরকমটি দাবি করেন না।

ভারতবর্ষের মুসলিম নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য রোকেয়া শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তিনি যুক্ত হয়েছিলেন শিক্ষা আন্দোলনের

সঙ্গে। সেসময়ের ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর —'মুসলিম নারীর'— জন্য তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই উদ্যোগেরই একটি দিক হলো পাড়ায় পাড়ায়, এলাকায় এলাকায় নারীদের শিক্ষা-অনুরাগী করে তোলার চেষ্টা। শিক্ষা ও নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে হলে ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নির্মোহ চিত্রই সামনে নিয়ে আসতে হয়, রোকেয়া তাই করেছেন। পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর পক্ষপাতপূর্ণ সমর্থন অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বিচার-বিবেচনা সামনে নিয়ে আসেন। এ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষার বহুবিধ অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব অন্তরায়ের কারণে শিক্ষার সঠিক বিস্তারে সহায়তা হচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি। একই পরিস্থিতি তিনি লক্ষ করেন ইউরোপের ক্ষেত্রেও। রোকেয়া তাঁর অগ্রন্থিত 'আশা-জ্যোতিঃ' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে মন্তব্য করছেন :

> "আমাদের শিক্ষার অন্তরায় অনেক, জানি; বাঙ্গালী মুসলমানগণ অত্যন্ত নারী-বিদ্বেষী, ইহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হতে জ্ঞানপুরীর তোরণ রক্ষা করিতেছেন, জানি; তবু আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নেই। সকল দেশেই কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়। ইংলন্ডের পুরুষসমাজ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা রমণীদের "ব্লুষ্টকিং" বলিয়া বিদ্রুপ করেন; শিক্ষিতা বঙ্গবালাও "নভেলপাণি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৩২)।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে তিনি বঙ্গনারীর সঙ্গে পাশ্চাত্য নারীর তুলনা দাঁড় করিয়েছেন। এই তুলনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গনারী যেমন বঞ্চিতা, ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য নারীও তদ্রুপ। পাশ্চাত্য সম্পর্কে রোকেয়ার কাছে তথ্য ও জ্ঞান উভয় ছিলো। এই তথ্য ও জ্ঞানের আলোকে তিনি পাশ্চাত্য নারীর সঙ্গে ভারতবর্ষের নারীর তুলনা দাঁড় করেছেন। তুলনামূলক পর্যালোচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে আপত্তি রয়েছে। ইংল্যান্ডের অনেক লেখক-লেখিকার রচনা তিনি পাঠ করেছেন। 'ডেলিশিয়া-হত্যা' শীর্ষক রচনায় তিনি ডেলিশিয়ার জীবনসংগ্রাম ও সামাজিক অস্তিত্বের বিপন্নতার ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে এর প্রমাণ দেখিয়েছেন।

রোকেয়ার পাশ্চাত্য প্রীতির নমুনা প্রসঙ্গে মজুমদারের আলোচনায় আরো সমর্থন মেলে। সেখানে তিনি লিখছেন,

> "গ্রন্থরচয়িত্রীর নামের পূর্ব্বে 'মিসেস' সংযোগ দেখিয়া পাশ্চাত্যে যে তাঁহার অনুরাগ আছে, তাহা বুঝিলাম।...প্রাচ্যের কি কিছুই নাই, না ছিল না? আমরা জানি, প্রাচ্যের সংস্পর্শেই পাশ্চাত্য আজ এত উন্নত। কাঠ, টিন, মাটির দুইটা বিলাস-সামগ্রী, তামসিক উন্নতিসূচক ঐশ্বর্য্যসম্ভার লইয়া নবাভ্যুত্থিত প্রতীচ্য উপস্থিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাববৃদ্ধ প্রাচ্য কি সর্ব্বদা তাহার অনুসরণ করিবে? ... প্রকৃত সভ্যতা এবং সমাজাদি সম্বন্ধেও কি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নিকট শিখিতে যাইবে? আমাদের

> বহির্ব্বাটী যে কারণেই হউক, পাশ্চাত্যের ভাবসাগরের তরঙ্গ মধ্যে ডুবু ডুবু। আমাদের অন্তঃপুরও যদি ঐ ভাবে ডুবিতে যায়, তবে বড় আশঙ্কার কথা। ... অন্তঃপুরে প্রাচ্যভাব আছে বলিয়াই আজও প্রাচ্যের চিহ্ন সংসারে টিকিয়া আছে। আমরা কামনা করি, প্রাচ্য-ললনা প্রাচ্যভাবে জাগিবেন।...আমরা *অন্তঃপুরে জননীজাতির পূর্ণ স্বাধীনতা* দেখিতে চাই।...প্রাচ্যের উন্নতি পাশ্চাত্যভাবে নহে, প্রাচ্যভাবেই হইবে" (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ২০০১ : ৫৬৩)।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির মূল স্পিরিট হলো — "পাশ্চাত্য আদর্শ প্রাচ্যের উপযোগী নহে" (মজুমদার, ২০০১ : ৫৬৩)। একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি দাবি করেন যে, "প্রাচ্যের উন্নতি পাশ্চাত্য ভাবে নহে; প্রাচ্য ভাবেই হইবে" (মজুমদার, ২০০১ :৫৬৪)। তাহলে অনুপযুক্ত এক পাশ্চাত্য আদর্শ রোকেয়ার মাথায় চেপে বসেছিলো, মজুমদারের বক্তব্য থেকে এমনটা ধারণা করা যায়। তবে রোকেয়ার বিরুদ্ধে মজুমদারের এই অবস্থানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। রোকেয়ার 'ডেলিশিয়া হত্যা" প্রসঙ্গ এনে বিষয়টি স্পষ্ট করতে পারি।

ডেলিশিয়া-হত্যা রচনায় তিনি যে চিত্র নিয়ে এসেছেন, তা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষের নারী, আর পাশ্চাত্য নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর আলোচনায় আঠার শতকের লেখিকা মেরি ক্যারেলি'র (Corelli, 1996 [1890]) উল্লেখ পাই। মেরি ক্যারেলি'র জীবন-অভিজ্ঞতা, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত ও বেড়ে-ওঠার সংগ্রাম ভারত-বাংলার কোনো নারীর জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা নয়। একটি ভূমিকাসহ মোট বারোটি অধ্যায়ের এই গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রোকেয়া নিজের মতো করে উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'ডেলিশিয়া-হত্যা' শিরোনামে। মেরি ক্যারেলি'র *A Romance of Two Worlds* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে। মেরি ক্যারেলি'র এ গ্রন্থের সঙ্গে রোকেয়ার পরিচয় হবার সম্ভাবনা কম। রোকেয়ার বিয়ে হয় বিলেতে পড়াশোনা-করা সাখাওয়াত হোসেন-এর সঙ্গে। তখন রোকেয়ার বয়স মাত্র ষোল (আনুমানিক সময়কাল ১৮৯৬-৯৭)। সে সময় প্রকাশিত হয় *The Murder of Delicia* শীর্ষক গ্রন্থটি। স্বামী সাখাওয়াতের মাধ্যমে হয়তো তিনি এ গ্রন্থের সন্ধান পেয়ে থাকতে পারেন। *উক্ত গ্রন্থের* অনুবাদ করেননি *রোকেয়া*। গল্পের নির্যাস নিয়ে কিছু বিষয় পর্যালোচনা করেছেন মাত্র। এ পর্যালোচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের নারী ও ইংল্যান্ডের নারীর সামাজিক অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। রোকেয়ার উপর্যুক্ত দাবির প্রমাণ মেলে তাঁর নিম্নোক্ত উদ্বৃতিতে :

> "ডেলিশিয়া কাহিনির সহিত আমাদের নারীসমাজের এমন চমৎকার সাদৃশ্য আছে যে, গ্রন্থখানি পাঠকালে অবাক হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—এ পোড়া ভারত অন্তঃপুরের কথা/জানিল কী ছলে মেরি

> করেলি!/অদ্য আমরা ইংলন্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সমাজের দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব, অবলা পীড়নে কোন্ সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৫)।

পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লবের প্রসঙ্গে আসা যাক। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপের অর্জনের তালিকায় রয়েছে— শিল্পবিপ্লবের সুফল, ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ, জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপন। নিজ দেশে জনগণের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশেও তাদের দাবি হলো সবার ওপরে। অথচ, সেই ইংল্যান্ডে নারীর যে করুণ ও বেহাল অবস্থা, তা ভারতবর্ষের অশিক্ষা-কুশিক্ষায় থাকা নারী অপেক্ষা আলাদা নয়। অবস্থাদৃষ্টে, কিংবা, তাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আমরা এ-রকমটি জানি। কিন্তু, এই গ্রন্থের বর্ণনা থেকে রোকেয়া নিশ্চিত হয়েছেন যে, "... একবার তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর। সভ্যতা ও স্বাধীনতার লালনভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত 'ডেলিশিয়া বধকাব্য' নিত্য অভিনীত হয়" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৫)। রোকেয়ার বর্ণনা থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি :

এক. বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডের, তথা ইউরোপের, মানবাধিকার ও নারীর স্বাধীনতা নিয়ে যা জেনেছি, তা সম্পূর্ণ নয়, আংশিক চিত্র মাত্র। নারীর স্বাধীনতা, পুরুষের সমকক্ষ হওয়া ও সমাজে আদৃতা হবার দাবি ফাঁকা বুলি মাত্র। ভারতবাসী নারীর মতো গোটা পৃথিবীর নারীই অবলা। এদের অবস্থাও ইউরোপের ডেলিশিয়ার মতোই।

দুই. লেখিকা মেরি ক্যারেলি'র অন্তর্জ্বালা ও বুকের ভেতরে পুঞ্জীভূত কষ্টের দহন খুঁজে পেয়েছেন ডেলিশিয়া চরিত্রে। সেই দহনের কথা উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর লেখা *The Murder of Delicia* শীর্ষক উপন্যাসে। রোকেয়া আমাদের মজলুমা নারীর দুরবস্থা থেকে ডেলিশিয়ার দুরবস্থাকে আলাদা করে দেখেননি। একজন সমাজতাত্ত্বিকের মতো তিনি তুলনা টেনেছেন। তুলনার সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইউরোপের নারী "বেশ প্রতিপত্তিশালী, জগতের চক্ষে ধাঁধা লাগান", সে বিদুষীও। ভারতবর্ষের 'মজলুমা নারী' অশিক্ষিতা; সে আঘাত গ্রহণ করে, প্রত্যাঘাত করে না। ইংল্যান্ডের নারী শিক্ষিতা, সে মুখ বুঝে সহ্য করে না, বরং প্রত্যাঘাত করে। এতোসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় এলাকার নারী কিন্তু নির্যাতিতা। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া উল্লেখ করছেন, "উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িতা!" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৫)।

পাশ্চাত্য নারী যে কিনা বিদুষী ও শিক্ষিতা সেও নিপীড়িতা। আবার ভারতবর্ষের নারী যাকে রোকেয়া নাম দিয়েছেন 'মজলুমা' সে-ও নির্যাতিত ও নিপীড়িতা। রোকেয়ার

তুলনামূলক আলোচনার মাহাত্ম্য হলো এই যে, উভয় সমাজের নারীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'মজলুমা' [ভারতীয় নারী] মুখ বুঝে সহ্য করে, আর ইউরোপীয় নারী 'তেজস্বিনী'—প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ উভয়ই তার মধ্যে রয়েছে। *The Murder of Delicia* শীর্ষক উপন্যাসের ডেলিশিয়া সেরকমই একজন নারী। ভারতবর্ষের নারী ও ইউরোপীয় নারীর মাঝে মিল হলো তারা উভয়ই সমাজের নিপীড়নের শিকার। তবে, উভয় নারীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা তিনি নিখুঁত সমাজতাত্ত্বিকের মতো বর্ণনা করেছেন :

> "সুশিক্ষিতা ডেলিশিয়া জীবন—সমর প্রাঙ্গণে অমিততেজা বীরার ন্যায় (স্বমীরূপ) গুপ্ত ঘাতকের শরাঘাতে নিহতা হয়, যৎকালে অশিক্ষিতা মজলুমা নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অত্যাচারী স্বামীর পদতলে মর্দ্দিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করে।" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৫)।

তেজস্বিনী ডেলিশিয়া গুলির বদলে পাল্টা গুলি করবার হুমকি দেবার সাহস রাখে। কিন্তু, ভারতীয় মজলুমা নারী এ-রকম প্রতিবাদ তো দূরের কথা, সে "বরং অত্যাচারীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া নাকিকান্না ধরিবেন—বলিবেন "প্রভো! দাসীর কি অপরাধ হইয়াছে?' দাসীর প্রতি সদয় হও! শেষে অশ্রুধারায় শ্রীচরণ যুগল ধুইতে বসিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত লাভ করিবেন..." (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৫)। 'ডেলিশিয়া হত্যা' শীর্ষক রচনার আলোকে রোকেয়ার ভাবনা পর্যালোচনা করলে আমরা এমনটা দাবি করতে পারি। তাঁর এই দাবিকে আমরা কয়েকটি দিক থেকে পর্যালোচনা করতে পারি:

এক. রোকেয়া তাঁর সময়কালের পাশ্চাত্য ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরিচয় ছিলো ইউরোপীয় সাহিত্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। এসব বিষয় তিনি নিবিড়ভাবে পাঠ করেছেন। পাঠশেষে তা বিচার করার সক্ষমতাও রোকেয়ার ছিলো। যেমন, *The Murder of Delicia* পাঠ শেষে ডেলিশিয়া চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন গ্রন্থের লেখিকা মেরি ক্যারেলি'র অসহায় অবস্থান। সর্বোপরি, ক্যারেলি ইউরোপবাসী নারীরই প্রতিচ্ছবি। এ পর্যালোচনায় রোকেয়া তৎকালীন ইউরোপীয় জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি সমালোচকের শ্যেন দৃষ্টি রেখেছেন। ইউরোপীয় উন্নয়ন ও সামাজিক জৌলুসের ব্যাপারে তিনি যুক্তিহীন ছিলেন না। আবার ভারতবাসী নারীর অবস্থা তথৈবচ হলেও এ নারী যে পুরুষের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর নন, নির্বিঘ্নে মেনে নিচ্ছেন — তার অসহায়ত্ব — সে মূল্যায়নেও রোকেয়া তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়েছেন।

দুই. পাশ্চাত্য নারী, আর ভারতবর্ষের নারীর — উভয়ের — জীবনের মূল্য, মর্যাদা, সামাজিক অবস্থা ও পরিস্থিতি পুরুষতান্ত্রিকতা দ্বারা নির্ধারিত। তবুও এই দুই এলাকার নারীর জীবন-যাপন ও বোধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখানে রোকেয়ার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিপতিত। পাশ্চাত্য নারী অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে নিজের মাথা চূর্ণ

করলেও সে তা অবনত করে না। পাশ্চাত্য নারী উন্নত মস্তকে প্রতিবাদের ভাষায় সমুচ্চারিত হয়, উন্নত সে মাথা অবনত করে কারো কাছে ভিক্ষা চায় না। সে জানে কিসে তার জীবনের মূল্য। বিপরীতক্রমে, ভারতীয় নারীর মধ্যে এই তৎপরতাটি নেই। ভারতবর্ষের মজলুমা নারী জন্ম থেকেই উপলব্ধি করে এবং মেনে নেয়, যা তাঁকে জন্ম থেকে বলা হয়েছে বারবার —"তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম।" চিরকাল যে নারী গোলাম, তার আত্মাও গোলামির শেকলে বাঁধা। এ শৃঙ্খল ভাঙার গান ভারতবর্ষের নারীর কণ্ঠে রোকেয়া শুনতে পাননি। ভারতবর্ষের নারী "পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদ-লেহনে বিরত হয় না।" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৬)।

তিন. রোকেয়া পরিচিত ছিলেন মিসেস হেনরি উডের (Wood, 1897) রচনার সাথে। তাঁর রচনায় তিনি লক্ষ করেছেন ইউরোপীয় জীবনের ক্ষত। পাশ্চাত্য, তথা ইংল্যান্ডবাসী নারীর জীবনেও রয়েছে নিপীড়ন ও বঞ্চনা। তবে ইউরোপবাসী নারী এসব নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চারও হন। রোকেয়া যেভাবে বলছেন, "... এত হিংসাবিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াও ইংরাজললনা মাথা তুলিয়েছেন... ।... এবার মোসলেম ললনার পালা" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ১৩৬৭ : ৩২)। সুতরাং, পাশ্চাত্য নিয়ে রোকেয়ার মধ্যে যুক্তিহীন অনুরাগ কাজ করেনি। বরং, পাশ্চাত্য প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টি ছিলো সমালোচকের। এর প্রগতি ও বিকাশের দিকসমূহ যা রোকেয়ার চোখে পড়েছে, সেখান থেকে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ-কারণে আমরা নিঃসকোচে দাবি করতে পারি যে, তাঁর চিন্তায় পাশ্চাত্যের প্রভাব ছিলো। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সামাজিক অগ্রগতির রেশ ও প্রভাব ভারতভূমিতে পড়ুক সেটা তিনি চেয়েছেন। আর, তা তিনি সর্বান্তকরণেই চেয়েছেন। সর্বোপরি, তিনি ইউরোপকে জেনেছেন, এ জানা সমালোচনাহীন নির্মোহ পাশ্চাত্যভক্তি ছিলো না। এ জানা একজন নির্মোহ সমালোচকের মতো। পাশ্চাত্য জগত হলো তাঁর কাছে অনেকটা জানালার মতো। শেখার এ জানালাটাকে তিনি বরাবরই মুক্ত রেখেছেন। শত বছর আগেও রোকেয়া জ্ঞানের বিকাশের এই ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

সাত

রোকেয়ার ভাবনায় স্বদেশ ও স্বরাজ

রোকেয়া যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা ছিলো ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। এ এক ভিন্ন বাস্তবতা ও ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে রোকেয়ার সময় ও রাজনীতি সক্রিয় ছিলো। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। আর, সমগ্র ভারত জুড়ে গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজ (১৯১৯-১৯৪৭) আন্দোলন চলছিলো। 'স্বদেশ' ও 'স্বরাজ' — উভয়ই — ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে

ধাবমান বিদ্রোহ। স্বরাজ আন্দোলন হলো ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের অভিঘাত সৃষ্টির সূত্র।

প্রশ্ন হলো রোকেয়ার সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে কীভাবে? ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন রোকেয়া। বিজ্ঞান ও সামাজিক ভাবাদর্শে কোথাও কোথাও ইউরোপ উন্নতি করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মমতা ও ভক্তিমিশ্রিত ধারাটি সেখানে নেই। এ পরিসরে রোকেয়া আমাদের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট নমনীয়। তাঁর এই নমনীয় ভাবটি আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে পাশ্চাত্যকে অনুধাবন করার মাধ্যমে। ক্ষুদ্র গণ্ডি ও পরিসরের মাঝে থেকে রোকেয়া এই মহান প্রয়াসে নিবেদিত ছিলেন। তাঁর চিন্তা ও কর্মের এই ধারাটির একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়—"Educational Ideals for the Modern Indian Girl" শীর্ষক নিবন্ধে। এই প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গে পশ্চিমা শিক্ষার মৌলিক ভেদটি কোথায়, তা উল্লেখ করেছেন। রোকেয়ার বিবরণটি উল্লেখ করে আমরা এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির একটি ধারা অস্তিত্বশীল রয়েছে। এই ধারাটি আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ ও শিক্ষাজীবন থেকে আলাদা। ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার লক্ষ্য ছিলো মহৎ ও সত্যানুসন্ধানী মানুষ সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাচীনকালে বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ও গণিতের মধ্যে অভূতপূর্ব সংমিলন ঘটেছিলো। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও জ্ঞানসাধনার লক্ষ্য ছিলো মানুষের মধ্যে সদ্ভাব, ভক্তি ও সহনশীলতার সৃজন করা। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দর্শন ও অধিবিদ্যার মতো উচ্চমার্গীয় বিদ্যার নিবিড় চর্চা হয়েছে এখানে। প্রাচীন ভারতের মানুষের মত-পথ ও জীবনাচরণ এখানকার জীবনে এনেছিলো অভাবনীয় পরিবর্তন। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে বিদ্যমান মূল্যবোধের এসব উপকরণ নিয়ে আমরা ভাবতে পারি। রোকেয়ার দাবি হলো— এসব প্রাচীন মূল্যবোধের কোনোপ্রকার সংস্কার ও পরিবর্তন না-করেই আমরা সমকালীন জীবনের সঙ্গে সমন্বিত করে ভাবতে পারি। কিন্তু, আমরা সাম্প্রতিক যে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করছি, তা আমাদের ভূমি ও মনন থেকে যোজন যোজন দূরে। বিদেশ-বিভূঁই থেকে তার আগমন। প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে এসব বিদেশি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কোনো মেলবন্ধন নেই, সাযুজ্য নেই। এমন কি আমাদের জাতীয় উন্নয়ন, চিন্তা ও সংস্কৃতিতে অবদান রাখার মতো কোনো সক্ষমতাও এর নেই।[২]

---

২. "Thus will have we render more beneficial our present educational system, the great defects of which is that it is an exoteric in an alien soil." (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪৭৯)।

শিক্ষা নিয়ে রোকেয়ার উপর্যুক্ত ভাবনায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিভাত হয়েছে। প্রথমেই তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির যে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র রয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যসূত্রে তিনি আমাদেরকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় জানিয়েছেন :

এক. ভারতীয় পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে বর্ণনা করেছেন "জীবনের প্রস্তুতি হিসেবে"। প্রাচীন শিক্ষা ও কারিকুলাম শুধুমাত্র বই-পুস্তকের শিক্ষার মধ্যে সীমিত ছিলো না। সেই সময় দৈহিক ও মানসিক বিকাশের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হতো। শিক্ষা দেয়া হতো প্রকৃতির সুনিবিড় ছায়াতলে। এর ফলে শিক্ষা ও শিক্ষণে গভীর মনোনিবেশ করা সম্ভব হতো। ছাত্রজীবন ছিলো চমকপ্রদ, তাদের শিক্ষা কর্মকাণ্ডে ছিলো সুস্থতা ও সহনশীলতার পরিচর্যা। দৈহিক শিক্ষার পাশাপাশি নীতিশিক্ষা সেসময়ের শিক্ষারই একটি অংশ ছিলো। তবে, বিশেষ বিধি-বিধান ও নিয়মের মধ্যে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করতে হতো। কীভাবে শোভন আচরণ ও নির্মল চরিত্র নিয়ে জীবন যাপন করা যায়, তা এ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিলো। শিক্ষার্থী যেন শিক্ষকের প্রতি বিনয় ও বিনীত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তার প্রতি ছিলো প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব।

দুই. আধুনিক শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাদর্শনের গভীর বিশ্লেষণে আমরা কয়েকটি বিষয় পাই : প্রথমত, আধুনিক শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য হলো—শিক্ষার্থীকে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে বিকশিত করে তোলা। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা বলতে শুধু কাজে ও কর্মে দক্ষ করে তোলাকে বোঝায় না। এ দক্ষতা হলো পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করা। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে তোলার প্রয়াস রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার এই নির্যাসটুকু গ্রহণ করেছিলেন রোকেয়া। একারণে তিনিও দাবি করেছেন, শিক্ষার কাজ হলো শিক্ষার্থীর দক্ষতার পাশাপাশি তাকে মানবীয় জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করা।

তিন. এশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল ও আদি উপাদান হলো ধর্মীয় ভাবধারা। প্রাচীন ভারতের, তথা এশিয়ার সবকটি মূলধারার ধর্মের বক্তব্য হলো—তরুণ ব্রাহ্মণকে সভ্য ও শিক্ষিত করে তোলা। এখানে শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা শুরু হয় জগৎ, ব্রহ্ম ও নৈতিক জীবনের জ্ঞান অর্জন দ্বারা। এ পর্ব শেষ হলে শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে। গার্হস্থ্য জীবনের ভেতর দিয়ে সে সামাজিক জীবন, সামাজিক জীবনের সফলতার ভেতর দিয়ে পরিশেষে সে 'সন্ন্যাস আশ্রম' গ্রহণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ হলো প্রাচীন ভারতের প্রচলিত শিক্ষারক্রম। কিন্তু, পাশ্চাত্য শিক্ষায় এ ক্রমউন্নতি অনুপস্থিত।

পশ্চিমের প্রতি আরেকটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি একই প্রবন্ধে : "Educational Ideals for the Modern Indian Girl" । এ প্রবন্ধের সারকথা হলো—আদর্শ ও পদ্ধতিভিত্তিক শিক্ষার জন্য আমাদের পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং, প্রাচীন ভারতের

শিক্ষার যে পদ্ধতি ও আদর্শ রয়েছে, তা যথেষ্ট উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধ। তবে, জীবন ও বাস্তবতার ধরন ও কৌশল পাল্টেছে। এই পাল্টে যাওয়া বাস্তবতার সঙ্গে মানানসই করে প্রাচীন শিক্ষাকে পর্যাপ্ত সংস্কার ও সময়োপযোগী করে নিতে হবে। এ ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রোকেয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ, কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তা আমাদের আলোচনার মুখ্য উপাদেয়।

প্রশ্ন হলো পশ্চিমকে আমরা কতোটা গ্রহণ করব, আর কতোটা বর্জন করব? এ প্রশ্নের ইঙ্গিতপূর্ণ উত্তরও রোকেয়ার আলোচনায় রয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতিতে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করার প্রশ্নে রোকেয়ার বক্তব্যটি পাঠ করা যাক : আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির একটি বড় সংকট হলো বিদেশ-বিভূঁইয়ের শিক্ষাকে নির্বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা। যেকোনো পদ্ধতি সেটা যদি আমাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না-হয় তাহলে তা আমাদের উন্নয়নের জন্য অক্ষম হয়ে পড়বে। একই সঙ্গে শিক্ষাকে আমাদের জাতীয় চিন্তা ও সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে বিশেষ যোগসূত্রতায় বাঁধতে হবে।[৩] যেমন, নারীর জন্য শিক্ষা কি ভারতীয় হবে, নাকি পশ্চিমা ধাঁচের?

উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে রোকেয়ার অবস্থান খুবই স্পষ্ট। এখানে তাঁর পশ্চিমা চিন্তা ও শিক্ষার গ্রহণ ও বর্জন — উভয় — অবস্থানটি উপলব্ধি করা যায় তাঁর লেখা শিক্ষা বিষয়ক "Educational Ideals for the Modern Indian Girl" শীর্ষক প্রবন্ধে। রোকেয়ার অবস্থান প্রসঙ্গে অন্তত দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রথম প্রসঙ্গটি নারীশিক্ষা নিয়ে। তিনি বলছেন যে, যখনই আমরা নারীশিক্ষার পক্ষে কথা বলছি, তখনই পাশ্চাত্য পদ্ধতি, পাশ্চাত্য শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ, যা আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, সে-সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। অথচ, আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে নারীর উৎকর্ষ, বিকাশ ও তাদের শিক্ষার উন্নয়নের বহুবিধ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্যকে আমাদের শিক্ষা বিস্তারে কাজে লাগাতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রোকেয়ার বক্তব্য হলো—"We should avoid its total neglect and a tendency to slavish imitations of Western custom and tradition" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪৭৯)।

প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে পশ্চিমা চিন্তা ও শিক্ষাকে গ্রহণ করা যেতে পারে — এই হলো রোকেয়ার সিদ্ধান্ত। পশ্চিমা রীতি ও ঐতিহ্যের প্রতি 'দাসসুলভ অনুকরণকে' (slavish imitations) রোকেয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবার, তিনি এটাও বলেছেন যে, ভারতবর্ষ পশ্চিম থেকে বহুকিছু শিখতে পারে। কিন্তু, সেসব পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পদ্ধতিকে

৩. "... the great defect of [our educational system] which is that it is an exotric in an alien soil. It is unsuited to our needs and equirements and incapable of developing the distinctive thread of our national thought and culture." (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪৭৯)।

কোনো প্রকার সংস্কার না করে, বা আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই না করে প্রয়োগ করা হবে ভুল পদক্ষেপ। এজন্য প্রয়োজন আমাদের প্রাচীন স্বর্ণযুগের সকল ইতিবাচক অর্জনকে জানা, এর আলোকে আমাদের নতুন জ্ঞানকে শানিত করা। ভারতবর্ষের প্রাচীন যে সামাজিক ধ্যান-ধারণা রয়েছে, অবশ্যই তার পুনর্জাগরণ করতে হবে। একইসঙ্গে পশ্চিমা শিক্ষাপদ্ধতির নতুনতর যে চর্চা ও ধারা রয়েছে, সেসবের যা কিছু আমাদের জন্য উপযোগী, তা অন্তর্ভুক্ত করা দোষের কিছু নয়। ভারতবর্ষের উৎকর্ষ ও পশ্চিমা জ্ঞানকৌশলকে সমন্বিত করে আমরা অগ্রসর হতে পারি। এর ফলে আমাদের চিন্তা ও শিক্ষা যেমন বিকশিত হবে, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনার ধারাও এ সমৃদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারবে। এ আলোচনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, এককভাবে, কিংবা নির্বিচারে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করেননি রোকেয়া।

আট

ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব : গান্ধী ও রোকেয়া প্রসঙ্গ

রোকেয়ার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ভারত পরিচিত ছিলো 'ব্রিটিশ-ভারত' হিসেবে। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার দিক থেকে মূলত 'ব্রিটিশ-ভারত' হলো ঔপনিবেশিক ভারত। পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে ইংরেজদের অনেককিছু গ্রহণ করেছেন রোকেয়া। কিন্তু, ঔপনিবেশিকতার প্রশ্নে তিনি কোনো আপস করেননি। গান্ধীর 'স্বরাজ' ও 'চরকা' নিয়ে তাঁর আগ্রহ তাই প্রমাণ করে। ঔপনিবেশিক ভারতে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রতীক হিসেবে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) চরকাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। চরকা ভারতবর্ষের কাপড় প্রস্তুতের দেশীয় যন্ত্র। ব্রিটিশদের প্রস্তুত হাল-ফ্যাশনের কাপড়ের পরিবর্তে জনগণকে দেশীয় কাপড় কেনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই তিনি চরকা ব্যবহারের কথা বলেছেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার প্রতীকও এই চরকা। এজন্য তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান করেন — চরকায় কাটা খাদি পোশাক পরার জন্য।

১৯২২ সালে প্রকাশিত *নবজীবন* পত্রিকার বিশেষ নিবন্ধে গান্ধী বলেন, স্বরাজের মতোই খাদি হলো আমাদের জন্মগত অধিকার। এর ব্যবহার করা আমাদের পূর্ণ জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য। কেউ যদি এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট না-হয় তার অর্থ হলো সে সামগ্রিকভাবে স্বরাজকেই অবজ্ঞা করলো (*Navajivan*, 5-3-1922; 23:11)। স্বরাজের সঙ্গে তিনি খাদি উৎপাদনের শর্তকে অনুসঙ্গ করে দেখেছেন। *নবজীবন* পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত এক নিবন্ধে গান্ধী বলেন, আমার কাছে এক ও একমাত্র তথ্য হলো খাদি সম্পর্কে আপনাদের জানানো। আপনারা আমার এক হাতে খাদি দেবেন, আমি আপনাদের হাতে স্বরাজ তুলে দেব। খাদি শুধু স্বরাজকেই সম্ভব করে তুলবে না, এ ভারতীয় অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘকালীন সদ্ভাব বজায় রাখার প্রতীক হিসেবেও ভূমিকা রাখবে।

খাদি ও চরকার মাহাত্ম্য বর্ণনায় গান্ধীর মূল্যায়ন আনেক বেশি নিবিড় ও তীক্ষ্ণ। তাঁর মতে, আমাদের সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে 'চরকা' সাহায্য করবে। আজ পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, একজন উত্তর-ভারতবাসী বাংলায় আসলে তার নিজেকে বিদেশি বেগানা মনে হতে পারে। একইভাবে একজন বাঙালি যখন দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণে যায়, সেখানে তার নিজেকে পরদেশি ভাবতে পারে। এই যে ভিন্নতা, তা ঘোচানোর জন্যই চরকা ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কেবলমাত্র চরকা পারে এসব জাতিগত পার্থক্য ও ভেদাভেদ দূর করে আমাদেরকে একই ভারতমাতার সন্তান হিসেবে ভাবতে সাহায্য করতে। এখন পর্যন্ত আমরা এ কাজে তেমন একটা অগ্রসর হতে পারিনি। যে কোনোভাবেই হোক, আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। বিদেশি বস্ত্র পরিহারের বিষয়ে আমাদেরকে অভিন্ন অবস্থানে আসতে হবে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, অস্পৃশ্যতা ও অন্ত্যজ শ্রেণি ভেদাভেদ হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে রাখছে। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের দ্বন্দ্ব বিরোধও লেগে আছে। এ সবকিছু দূর করা সম্ভব। আমরা যদি খাদির ওপর, চরকার উপর নির্ভরশীল না-হই, তাহলে দ্বন্দ্ব-সংঘাতও দূর হবে না, দারিদ্র্যও থেকে যাবে (Speech at Shantiniketan on 31-5-1925; 27:181)।

খাদির সঙ্গে চরকার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার একান্ত প্রয়াস ছিল গান্ধীর (Gandhi, 2001 : 107)। এই সম্পর্কের সূত্রে গান্ধীর বক্তব্য হলো — স্বরাজ ও চরকা পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। আমাদের একশ মিলিয়ন ভাইবোন যদি চরকাকে হাতে তুলে না নেয়, যদি সুতা না কাটে, যদি তারা খাদি তৈরি ও পরিধান না করে, তাহলে তার 'স্বরাজ' আসবে না। গান্ধী দাবি করেন যে, আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যদি তোমরা বিদেশি কাপড় পরিহার করো, ভারতীয় চরকায় প্রস্তুত খাদি পরিধান করো, তাহলে এক বছরের মধ্যেই তোমরা 'স্বরাজ' পাবে। এই স্বরাজ হলো স্বাধীনতা। আর, খাদি হলো সেই স্বাধীনতা পাবার উত্তম মাধ্যম। সর্বোপরি, ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে চরকা ও খাদি প্রতিভূ শক্তি। এই শক্তি জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

চরকার প্রয়োজনীয়তা ও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে রোকেয়া কথা বলেছেন তাঁর লেখা 'চাষার দুক্ষু' শীর্ষক প্রবন্ধে। চরকার জন-ব্যবহার নিয়ে তিনি উল্লেখ করছেন, "কৃষক-রমণী স্বহস্তে চরকায় সূতা কাটিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ২১৩)। অথচ, এই চরকা হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন থেকে। বিকশিত হচ্ছে সভ্যতা, উন্নত হচ্ছে তার অনেককিছুই, অথচ এর সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে চরম দারিদ্র্য। তিনি প্রশ্ন করছেন, "...যেহেতু আপাতঃ— সুলভ মূল্যে বিবিধ রঙ্গীন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চরকা লইয়া ঘর্ঘর করিবে কেন?" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ২১৩)। এ প্রশ্ন চরকার বিরুদ্ধে নয়, এ হলো আত্মজিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার ওপর ভর করে সম্ভব জাতীয় মুক্তিকে ত্বরান্বিত করা।

চরকা নিয়ে রোকেয়ার আরেকটি নিবিড় আলোচনা লক্ষ করা যায় তাঁর 'বলিগর্ত্ত' শীর্ষক নিবন্ধে। 'চরকা'-প্রীতির বেশকিছু নমুনা আমরা তাঁর 'বলিগর্ত্ত' প্রবন্ধে পাই। একটি নির্জলা সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা 'বলিগর্ত্ত'। উক্ত রচনায় কমলা ও লেখিকার সঙ্গে আলাপচারিতায় রোকেয়া 'চরকার' প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। চরকা প্রসঙ্গ আনার পেছনে রোকেয়া-মানসের দুটি বিষয় প্রতিভাত হয়েছে : প্রথমত, রোকেয়া গান্ধীর 'চরকা' আন্দোলন ও দেশীয় পণ্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর জীবনসংগ্রামেও এই আগ্রহের বীজ প্রোথিত ছিলো, যাতে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা ধরা পড়ে। কমলাকে উদ্দেশ্য করে রোকেয়ার অন্য একটি বক্তব্য লক্ষ করা যাক — "খুব সহজেই চরকার প্রচার করিতে পারিবেন" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪৩১)। অন্যত্র কমলা ও লেখিকার সংলাপ লক্ষ করা যাক : "চরকা চালাইতে পারিলে মিসিস খট-খটেদের হারের তৈরী সূতায় প্রস্তুত প্রথম খদ্দরখানা তোমাকে দিব" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪৩২)।

রোকেয়ার এই অভিব্যক্তি দুই অনুষঙ্গকে সামনে নিয়ে আসে —এক. তিনিও গান্ধীর স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনের প্রতি নির্মোহ ছিলেন। দুই. রোকেয়া মনে করতেন যে, গান্ধীর স্বরাজ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার। রোকেয়া সেই হাতিয়ার ধারণ করেছেন, সমর্থন দিয়েছেন। এই সমর্থনে তাঁর ব্রিটিশবিরোধী (অন্যভাবে বললে পাশ্চাত্য) ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এর অর্থ হলো পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতি রোকেয়া একেবারে নির্মোহ ছিলেন, তা বলার উপায় নেই।

নয়

ইউরোপের প্রতি রোকেয়ার অনাস্থা

রোকেয়ার বিভিন্ন নিবন্ধ, কল্পকথা ও উপন্যাস পাঠ করে এটুকু বোঝা যায় যে, তিনি সমভাবাপন্ন সমাজের কথা ভেবেছেন, যা হবে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারে সমৃদ্ধ। নবজাগরণের শিক্ষায় দীক্ষিত ইউরোপ এ পথে পা বাড়িয়েছে। অনেকের মতোই রোকেয়ারও এমন ধারণা ছিলো যে, ভারতবর্ষের জন্যও জাগরণ প্রয়োজন। তবে তা কি পাশ্চাত্য জাগরণ? এ নিয়ে রোকেয়ার মনে প্রশ্ন ছিলো। রোকেয়া গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের পাশাপাশি কবিতাও লিখেছেন। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে পাশ্চাত্য [পাশ্চাত্য প্রতিভূশক্তি বৃটিশ] বিরোধীতার বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় *ধূমকেতু* পত্রিকায় রোকেয়ার 'নিরুপম বীর' শিরোনামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এ কবিতাটি বিপ্লবী কানাই দত্তকে নিয়ে লেখা। কবিতার সারকথায় যাবার পূর্বে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যাঁরা উপনিবেশের বিরুদ্ধে এবং ইউরোপীয় দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন ও জীবন উৎসর্গ করেছেন — রোকেয়া তাঁদের স্তুতি

করেছেন। এই স্তুতি বস্তুত উপনিবেশীদের প্রতি প্রত্যাখ্যানের শামিল। কার্যত তা হলো ইংল্যান্ড, তথা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা।

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্ষুদিরাম বসুর পরে যে মহান সন্ত দেশ-মাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনি কানাই দত্ত। সাহসী, উদ্যমী, অথচ দেশের জন্য অসীম প্রেম ছিল তাঁর কর্মে ও আদর্শে। ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময় তাঁকে বেশ হাস্যময় ও প্রশান্ত দেখাচ্ছিলো। বধ্যভূমিতে রাখা মৃত্যুযাত্রী কানাই ছিলেন নির্বিকার ও ধীর-স্থির। সাপের ফণার মতো ঝুলে থাকা দড়ির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্রিটিশ পুলিশের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন। ব্রিটিশ পুলিশ বুঝে নিলো—নির্ভীক এ চোখে মৃত্যুভয় নেই, শুধুই প্রতিশোধ, আর মুক্তির আগুন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এই বিপ্লবীকে স্মরণ করেছেন রোকেয়া তাঁর 'নিরুপম বীর' কবিতায়। তাঁর কবিতা থেকে উদ্বৃত করতে পারি : "বীর সন্তান, জাগিয়া প্রভাতে// স্মরিবে কানাই নাম;/ প্রাতঃস্মরণীয় কানাই মোদের,/ বল বল "বন্দে শ্যাম"// (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬, 'নিরুপম বীর' : ৪৬০)। কবিতাটি তিনি বিপ্লবী কানাইয়ের ফাঁসির অনতিপর লিখেছেন।

কানাইকে স্মরণের ভেতর দিয়ে রোকেয়া মূলত ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের বিপ্লব ও সংগ্রামকে অভিবাদন জানিয়েছেন। কানাইকে স্মরণ করে লেখা রোকেয়ার কবিতা স্বাধীনতার মন্ত্রণাকে উজ্জীবিত করারই মন্ত্রণা। কানাইয়ের অমর আত্মাকে রোকেয়া বাঙালি প্রাণে জাগ্রত করেছেন বলা যায়। এ যেমন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে জাগিয়ে তোলার প্রেরণা, শুভ প্রয়াস, তেমনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এক দ্রোহও বলা যায়।

পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়ে রোকেয়ার আগ্রহ ও সাহিত্য মূল্যায়ন উভয়ই লক্ষ করা যায়। এতে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু নির্মোহ ও সমালোচনাহীন ছিলেন বলা যাবে না। তাঁর 'ডেলিশিয়া হত্যা' শীর্ষক রচনায় আমরা তেমনটিই লক্ষ করি। একটি ভূমিকাসহ মোট ১২ অধ্যায়ের এই গ্রন্থটি রোকেয়া সারসংক্ষেপ করে নিজের মতো করে উপস্থাপন করেছেন 'ডেলিশিয়া-হত্যা' শিরোনামে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *The Murder of Delicia।* সে-সময় রোকেয়ার এসব গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় হবার সম্ভাবনা কম। রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিলো বিলেতে পড়াশোনা করা সাখাওয়াত হোসেন-এর সঙ্গে। সেসময় প্রকাশিত হয় *The Murder of Delicia* শীর্ষক গ্রন্থটি। সাখাওয়াতের মাধ্যমে হয়তো তিনি এ গ্রন্থের সন্ধান পেয়ে থাকতে পারেন। *The Murder of Delicia* গ্রন্থের অনুবাদ করেননি তিনি। গল্পের নির্যাস নিয়ে তিনি পর্যালোচনা করেছেন মাত্র। ডেলিশিয়া-হত্যা রচনায় তিনি যে চিত্র নিয়ে এসেছেন, তা ভারতবর্ষের নারী, আর পাশ্চাত্য নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। মেরি ক্যারেলি'র জীবন-অভিজ্ঞতা, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত ও বেড়ে-ওঠার সংগ্রাম ভারত-বাংলার কোনো নারী থেকে আলাদা নয়। এ পর্যালোচনায় ভারতবর্ষের নারী ও ইংল্যান্ডের

নারীর সামাজিক অবস্থানের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেননি বলে মন্তব্য করেন তিনি। রোকেয়ার লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যাক :

> "ডেলিশিয়া কাহিনির সহিত আমাদের নারীসমাজের এমন চমৎকার সাদৃশ্য আছে যে, গ্রন্থখানি পাঠকালে অবাক হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—এ পোড়া ভারত অন্তঃপুরের কথা/জানিল কী ছলে মেরি করেলি!/অদ্য আমরা ইংলন্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সমাজের দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব, অবলা পীডনে কোন্ সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৫)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, বিশেষত বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপের অর্জনের তালিকায় রয়েছে শিল্পবিপ্লবের সুফল। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত সমৃদ্ধ অর্থনীতি, জাঁকজমকপুর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য। নিজ দেশে জনগণের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশেও তাদের দাবি হলো সবার ওপরে। অথচ, সেই ইংল্যান্ডে নারীর যে করুণ ও বেহাল অবস্থা, তা ভারতবর্ষের অশিক্ষা-কুশিক্ষায় নিমজ্জিত থাকা নারী অপেক্ষা আলাদা নয়। অবস্থাদৃষ্টে, কিংবা তাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আমরা এ-রকমটি জানি। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া নিশ্চিত হয়েছেন যে, "... একবার তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর। সভ্যতা ও স্বাধীনতার লালনভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত 'ডেলিশিয়া বধকাব্য' নিত্য অভিনীত হয়" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৫)। রোকেয়ার এই বর্ণনা থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি :

এক. বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডের, তথা ইউরোপের, মানবাধিকার ও নারীর স্বাধীনতা নিয়ে যা জেনেছি, তা সম্পূর্ণ নয়, আংশিক চিত্রমাত্র। নারীর স্বাধীনতা, পুরুষের সমকক্ষ অবস্থান ও সমাজে আদৃতা হবার দাবি তখন শুধু ফাঁকা বুলি ছিলো। ভারতবাসী নারীর মতো গোটা পৃথিবীর নারীই তখন অবলা ছিলো।

দুই. লেখিকা মেরি ক্যারেলি তাঁর অন্তর্জ্বালা ও বুকের ভেতরে পুঞ্জীভূত কষ্টের দহন খুঁজে পেয়েছেন ডেলিশিয়া চরিত্রে। সেই দহনের কথা উপস্থাপিত হয়েছে *The Murder of Delicia* শীর্ষক উপন্যাসে। রোকেয়া মজলুমা নারীর দুরবস্থা থেকে ডেলিশিয়ার দুরবস্থাকে আলাদা করে দেখেননি। এখানে রোকেয়া একজন সাহিত্য-সমালোচক ও দার্শনিকের মতোই তুলনা করেছেন। উক্ত তুলনার সাহয্যে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইউরোপের নারী "বেশ প্রতিপত্তিশালী, জগতের চক্ষে ধাঁধা লাগান", তারা বিদুষীও। ভারতবর্ষের 'মজলুমা নারী' অশিক্ষিতা। এতোসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দু'জনই নির্যাতিতা। রোকেয়া স্পষ্টত উল্লেখ করছেন, "উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িতা!" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৫)। এর অর্থ হলো নারীর জন্য সমতাবাদী সামাজিক সংস্কৃতি নির্মাণে পশ্চিমও পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।

পাশ্চাত্য নারী বিদুষী ও শিক্ষিতা, সে আবার নিপীড়িতও। ভারতবর্ষের নারী, যাকে রোকেয়া নাম দিয়েছেন 'মজলুমা', সেও নির্যাতিত ও নিপীড়িত। রোকেয়ার তুলনামূলক আলোচনার মাহাত্ম্য এখানে, কারণ তিনি উভয় সমাজের নারীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য দাঁড় করিয়েছেন। 'মজলুমা' [ভারতীয় নারী] মুখ বুজে সহ্য করে, আর ইউরোপীয় নারী 'তেজস্বিনী'— প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ— উভয়ই — তাঁর মধ্যে রয়েছে। *The Murder of Delicia* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ডেলিশিয়া সে-রকম স্বভাবের নারী। ভারতবর্ষের নারী ও ইউরোপীয় নারীর মধ্যে মিল হলো তারা উভয়ই সমাজিক নিপীড়নের শিকার। তবে, পার্থক্য বর্ণনায় রোকেয়া একজন নিখুঁত সমাজতাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন :

> "সুশিক্ষিতা ডেলিশিয়া জীবন—সমর প্রাঙ্গণে অমিততেজা বীরার ন্যায় (স্বামীরূপ) গুপ্ত ঘাতকের শরাঘাতে নিহতা হয়, যৎকালে অশিক্ষিতা মজলুমা নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অত্যাচারী স্বামীর পদতলে মর্দ্দিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করে।" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১১৫)।

তেজস্বিনী ডেলিশিয়া গুলির বদলে পাল্টা গুলি করবার হুমকি দেবার সাহস রাখে। কিন্তু, ভারতীয় মজলুমা নারী এ-রকম প্রতিবাদ তো দূরের কথা, সে "বরং অত্যাচারীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া নাকিকান্না ধরিবেন—বলিবেন "প্রভো! দাসীর কি অপরাধ হইয়াছে?" দাসীর প্রতি সদয় হও! শেষে অশ্রুধারায় শ্রীচরণ যুগল ধুইতে বসিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত লাভ করিবেন...।" 'ডেলিশিয়া হত্যা' রচনার আলোকে রোকেয়ার ভাবনা পর্যালোচনা করতে পারি :

এক. রোকেয়া তাঁর সময়কালের পাশ্চাত্য ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরিচয় ছিলো পাশ্চাত্য সাহিত্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে। সেসব তিনি নিবিড়ভাবে পাঠ করেছেন। কিন্তু, পাঠশেষে তা বিচার করার সক্ষমতাও রোকেয়ার ছিলো। যেমন, *The Murder of Delicia* শীর্ষক গ্রন্থটি পাঠ করেছেন তিনি। তিনি ডেলিশিয়া চরিত্রের মধ্যে খুঁজে ফিরেছেন গ্রন্থের লেখিকা মেরি ক্যারেলি'র অসহায়ত্বের কথকতা। সর্বোপরি, এ ক্যারেলি ইউরোপবাসী নারীরই চিত্র। রোকেয়ার এ পর্যালোচনায় তৎকালীন ইউরোপীয় জীবন ও সামাজিক সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্যেন দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। ইউরোপীয় উন্নয়ন ও সামাজিক জৌলুস নিয়ে তিনি যুক্তিহীন ছিলেন না। আবার, ভারতবাসী নারীর অবস্থা তথৈবচ হলেও এ নারী যে তার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর নন, নির্বিঘ্নে মেনে নিচ্ছেন তার অসহায়ত্ব সে মূল্যায়নেও রোকেয়া তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়েছেন।

দুই. পাশ্চাত্য সমাজের নারী, আর ভারতবর্ষের নারীর —উভয়ের— জীবন মর্যাদা, সামাজিক অবস্থা ও পরিস্থিতি সবই পুরুষতান্ত্রিকতা দ্বারা নির্ধারিত। তবে, দু'জনের পার্থক্য কোথায়? এখানেই রোকেয়ার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিপতিত। পাশ্চাত্য নারী অত্যাচারে

নিজের মাথা চূর্ণ করলেও সে তা অবনত করে না। ইউরোপের নারী উন্নত মস্তকে প্রতিবাদের ভাষায় সমুচ্চারিত হন, উন্নত সে মাথা অবনত করে কারো কাছে ভিক্ষা চায় না। সে জানে কোথায় রয়েছে তার জীবনের মূল্য। বিপরীতক্রমে, ভারতীয় নারীর মধ্যে এই তৎপরতাটি নেই। ভারতবর্ষের মজলুমা নারী জন্ম থেকেই জেনে আসে—"তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম।" চিরকাল যে নারী গোলাম, তার আত্মাও গোলামির শিকলে বাঁধা। এ শৃঙ্খল ভাঙার গান ভারতবর্ষের নারীর কণ্ঠে রোকেয়া শুনতে পাননি। ভারতবর্ষের নারী "পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদ-লেহনে বিরত হয় না।" (রোকেয়া, ২০০৬ : ১১৬)।

দশ

রোকেয়ার ইউরোপপ্রীতি [ব্রিটিশপ্রীতি]

রোকেয়ার কর্ম ও চিন্তায় কোথাও ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতি নির্মোহ সমর্থন ছিলো না। ব্রিটিশদের অনেক অবদানকে তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রহণ ও বর্জনের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। এরকম অসংখ্য নমুনা ও দৃষ্টান্ত তাঁর লেখায় রয়েছে। বিশেষ করে তাঁর শিক্ষা ও শিক্ষা আন্দোলন পরিকল্পনায় ঔপনিবেশিক শক্তি ইংল্যান্ডের শিক্ষাভাবনার প্রতি আগ্রহ ছিলো। তবে, তাদের শিক্ষাও যে চ্যুতি-বিচ্যুতিমুক্ত সে-রকমটি দাবি করা যাবে না বলে রোকেয়া মনে করেছেন। তাঁর অগ্রন্থিত রচনায় তিনি দাবি করছেন, "লাহোর, বোম্বাই ও আলীগড় নিবাসী লোকের সহিত ঐক্য রক্ষা করিতে হইলে সকলকে একটি সাধারণ ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। সেই ভাষা বাংলা হইলে ভাল হয়; ..."। রোকেয়া শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সব থেকে পশ্চাৎপদ 'মুসলিম নারীর' জন্য তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই উদ্যোগেরই একটি দিক হলো পাড়ায় পাড়ায়, এলাকায় এলাকায়, নারীদের শিক্ষা অনুরাগী করে তোলার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা।

ভারতবর্ষের শিক্ষার হালহকিকত ও নারীর সামাজিক অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নির্মোহ চিত্রও তিনি সামনে নিয়ে এসেছেন। নিরপেক্ষ এই বর্ণনায় ইউরোপের প্রতি রোকেয়ার পক্ষপাতিত্বপূর্ণ সমর্থন প্রকাশ পায় না। বরং, তাঁর যুক্তিসমৃদ্ধ বিচার-বিবেচনা সামনে চলে আসে। ভারতবর্ষের শিক্ষার বহুবিধ অন্তরায় যেমন এর শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করছে না, ইউরোপের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি বিদ্যমান। রোকেয়া তাঁর অগ্রন্থিত প্রবন্ধ 'আশা-জ্যোতিঃ'তে এ সম্পর্কে উল্লেখ করছেন,

> "আমাদের শিক্ষার অন্তরায় অনেক, জানি; বাঙ্গালী মুসলমানগণ অত্যন্ত নারী-বিদ্বেষী, ইহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হতে জ্ঞানপুরীর তোরণ রক্ষা করিতেছেন, জানি; তবু আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নেই। সকল

> দেশেই কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়। ইংলন্ডের পুরুষসমাজ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা রমণীদের "ব্লুষ্টকিং" বলিয়া বিদ্রুপ করেন; শিক্ষিতা বঙ্গবালাও "নভেলপাণি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬: ৩২)।

'ব্লুষ্টকিং' আর 'নভেলপাণি' উভয়ই তাচ্ছিল্যে ভরপুর শব্দ। ভারতীয় শিক্ষিতা বঙ্গবালাকে তাচ্ছিল্য করা হতো নভেলপাপি বলে, আর ইংল্যান্ডের শিক্ষিতা নারীকে বলা হতো 'ব্লুষ্টকিং' হিসেবে। উভয়ই উচ্চশিক্ষিতা নারীকে নিরুৎসাহিত ও তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা মাত্র। তাহলে এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইউরোপ সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞান উভয় ছিলো রোকেয়ার। ইংল্যান্ডের অনেক লেখক-লেখিকার রচনা তিনি পাঠ করেছেন। কার্যত তা নারীর প্রতিই এ তাচ্ছিল্য। তিনি 'ডেলিশিয়া-হত্যা' শীর্ষক রচনায় ডেলিশিয়ার জীবনসংগ্রাম ও সামাজিক অস্তিত্বের বিপন্নতার ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার, তিনি মিসেস হেনরি উডের (Wood, 1897) লেখাও পাঠ করেছেন। উভয় রচনায় তিনি লক্ষ করেছেন ইউরোপীয় জীবনের ক্ষত। ইউরোপ, তথা, ইংল্যান্ডবাসী নারীর জীবনেও রয়েছে নিপীড়ন ও বঞ্চনা। ইউরোপবাসী নারী এসব নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চারও হন। রোকেয়া যেভাবে বলছেন, "... এত হিংসাবিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াও ইংরাজললনা মাথা তুলিয়েছেন...।...এবার মোসলেম ললনার পালা" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ১৩৬৭ : ৩২)। সুতরাং, ইউরোপ নিয়ে রোকেয়ার মধ্যে যুক্তিহীন অনুরাগ কাজ করেনি। এ কারণে আমরা নিসঃকোচে দাবি করতে পারি যে, তাঁর চিন্তায় ইউরোপের প্রভাব রয়েছে। তবে, এটুকু বলা যায় যে, ইউরোপের শিক্ষা ও সামাজিক অগ্রগতির রেশ ও প্রভাব ভারতভূমিতে পড়ুক, সেটা তিনি চেয়েছেন সর্বান্তকরণে। রোকেয়া ইউরোপকে জেনেছেন এ জানা সমালোচনাহীন ইউরোপভক্তি নয়। এ জানা একজন নৈর্ব্যক্তিক সমালোচকের মতোই। আবার, শেখার জানালাটা মুক্ত রেখেছেন। শত বছর আগে রোকেয়ার জ্ঞানের বিকাশের বিভিন্ন ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

রোকেয়ার বিভিন্ন রচনায়, গল্পে ও কবিতায় আধুনিক জীবন ও যাপনের সঙ্গে পরিচয়ের তথ্যাদি পাওয়া যায়। এর মধ্যে ইংরেজি ভাষাভাষী কথোপকথন ও সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার অনেক দৃষ্টান্তও রয়েছে তাঁর বেশকিছু গল্পে। তাঁর 'পরী ঢিবি' ছোটগল্পে এ দাবির পর্যাপ্ত প্রমাণ মেলে। এ গল্পটি উর্দু থেকে ভাবান্তরিত। এখানেও তিনি পেয়েছেন ছোটবেলার সেইসব স্মৃতি ও রূপকথার উপস্থিতি। উল্লেখ রয়েছে রূপকথার দৈত্য, পরী ও পরীস্থানের কথা। ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি রোকেয়ার টানের কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে—'witches Hill' এর কথা। আমাদের লোকজ সংস্কৃতিতে যা 'পরী ঢিবি', ইংরেজি সংস্কৃতিতে তাই-ই 'witches Hill'। প্রাত্যহিক কথোপকথনে ইংরেজির প্রচলন : "you are a fool", অথবা, ইংরেজি ধরনে কাউকে অভিবাদন করা, ইংরেজ ভাষাভাষীদের বিনয় ও প্রতিক্রিয়ায় আচরণ করা :

"সুন্দরী মহিলা!... আমরা উভয়ে তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি,—যাহা প্রকৃত ভদ্রলোকের করা উচিত" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ৪২৯)। আবারও তাঁর পাঠ-অভ্যাসের বিশাল তালিকা পাই। পাশ্চাত্য সম্পর্কে জানার প্রতিফল এসবের প্রকাশ।

ইতোমধ্যে আমরা মেরি ক্যারোলি ও উডের আলোচনা লক্ষ করেছি রোকেয়ার বিভিন্ন রচনায়। 'পরী ঢিবি' গল্পে তিনি শেক্সপিয়রের নাটক *Midsummer Night's Dream এর* প্রসঙ্গ এনেছেন। এই উল্লেখ থেকে বলা যায় যে, ইউরোপীয় চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে রোকেয়ার পরিচয় ছিলো। 'পরী ঢিবি' শীর্ষক রচনার আরো কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা যাক। স্বপ্নে বিভোর লেখিকা পরীরাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে ইংরেজি নৃত্য "ফক্সট্রয়েট" হচ্ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে আমেরিকার বর্ণ নাইটক্লাবে ফক্সট্রয়েট নৃত্য পরিবেশন করা হতো। সেসময়ের অভিনেতা হ্যারি ফক্স এ-ধরনের নৃত্যের জন্য খুব বিখ্যাত ছিলেন। এ নাচের সময় এক বিশেষ ধরনের র‍্যাগটাইম সংগীত ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে বাজানো হতো। এসব মিলিয়ে এ নাচের নামকরণ করা হয়েছে ফক্সট্রট নৃত্য। জাজ ও বড় পরিসরের ব্রান্ড মিউজিকের সংমিশ্রণের সাথে মিল রেখে এ নৃত্য আমেরিকা, তথা পাশ্চাত্যে, বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। গল্পের অন্যত্র তিনি 'রকউড কলেজ' ও "ফ্যান্সি ড্রেস পিকনিক"-এর প্রসঙ্গও এনেছেন। রোকেয়া যে 'রকউড কলেজের' কথা বলেছেন, তা সেন্ট লুইসের সব থেকে বড় বিদ্যালয়। আবার, পশ্চিমা বিশ্বে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক উৎসব, ভোজন ও ভ্রমণ করার জন্য বিশেষ পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহারের রীতি রয়েছে। সেইসব পোশাককে পিকনিকের জন্য ব্যবহৃত 'ফ্যান্সি ড্রেস' বলা হয়ে থাকে। চার পাতার এই ভাবান্তরিত গল্পে রোকেয়ার সমসাময়িক পশ্চিমা সংস্কৃতির নানাকিছুর সঙ্গে পরিচিতির প্রমাণ মেলে। এই প্রমাণ থেকেই আপাতত আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, রোকেয়ার চিন্তাবিশ্ব নির্মাণে পশ্চিমা জ্ঞান ও ভাবধারার প্রভাব ছিলো।

পশ্চিমা সাহিত্যের সঙ্গে রোকেয়ার যোগাযোগের আরেক নতুন দিগন্ত লক্ষ করা যায় *মতিচূর* শীর্ষক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের 'নারী-সৃষ্টি' শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধের শুরু করেছেন তিনি রবার্ট জি ইঙ্গারসোল-এর *Mistakes of Moses* গ্রন্থের আলোচনা দিয়ে। গ্রন্থটি লেখা হয় ১৮৮০ খিস্টাব্দে; ঠিক রোকেয়ার জন্মের বছরে। গ্রন্থটি প্রকাশের পঁয়ত্রিশ বছর পর তিনি এ গ্রন্থ নিয়ে পর্যালোচনা করছেন। পর্যালোচনার লক্ষ্য হলো ইঙ্গারসোলের প্রাচ্যপ্রীতি। নারী-সৃজন নিয়ে তিনি প্রাচীনকালের একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করেন। উক্ত আখ্যায়িকার সূত্র ধরে ইঙ্গারসোল প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, "...বাইবেলের নারী-সৃষ্টির ইতিহাস অপেক্ষা ঐ প্রাচ্য গল্পের ভাব কত উচ্চ এবং কত উদার" (*রোকেয়া রচনাবলী*, 'নারী-সৃষ্টি', ২০০৬ : ১৪০)। প্রাচ্যের গল্প বলার ধরন ও কৌশল এবং এর অন্তর্নিহিত উপকরণ পাঠ করে পাশ্চাত্য

পণ্ডিতদের অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন। এই মুগ্ধতা দেখে যে কোনো প্রাচ্যবাসীরই উৎফুল্ল হবার কথা। এক্ষেত্রে রোকেয়ার অবস্থান একজন দার্শনিক ও সাহিত্য-সমালোচকের মতোই। যুক্তিহীন মুগ্ধতায় তিনি আকৃষ্ট ছিলেন না। বিচার বিশ্লেষণের নিরিখেই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন।

রবার্ট ইঙ্গারসোলের 'মুসার ভ্রম' শীর্ষক পৌরাণিক গল্পের কথা বলা হয়েছে, যা তিনি পাঠ করেছেন ইংরেজ লেখক মি. বেন-এর সংস্কৃতি থেকে ইংরেজি অনুবাদের সুবাদে। কিন্তু, পৌরাণিক এ গল্প প্রসঙ্গে রোকেয়ার অবস্থান ভিন্ন। 'নারী-সৃষ্টি' গল্পেও যে নারী, তা তিনি ইঙ্গারসোলকে শুনিয়ে দিচ্ছেন। সৃষ্টিদেবতা ত্বস্তির সঙ্গে রোকেয়া একটি কাল্পনিক সংলাপ উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সংলাপের কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

> "...পুরুষ বলিল, দেব! আমায় ক্ষমা করুন; আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, নারী আমার আনন্দের কারণ, না, বিরক্তির কারণ। তাহাকে লইয়া আমার সুখশান্তি অপেক্ষা কষ্টের ভাগই অধিক।...। আপনি কৃপাবশতঃ আমাকে ইহা হইতে মুক্তিদান করুন *(রোকেয়া রচনাবলী*, 'নারী-সৃষ্টি' : ১৪২)।

সংলাপের গতি দেখে যে কোনো ব্যক্তির বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ত্বস্তি দেবতা যেন পুরুষকে লক্ষ্য করেই নারী সৃষ্টি করেছেন। এ নারী পুরুষের জন্য বড়ই বিরক্তির কারণ, কষ্ট সৃষ্টিরও কারণ। তাই পুরুষের আর্জি হলো এ নারী হতে তাকে মুক্তি দেওয়া। দেবতার ক্রুদ্ধ প্রস্তাবে পুরুষের ফের অনুনয় : "এ যে আমার কালস্বরূপ, ইহার সহিত জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যে কিছুতেই ইহার সঙ্গে থাকিতে পারি না!" *(রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬, 'নারী-সৃষ্টি' : ১৪২)। ত্বস্তি দেবতার ক্রুদ্ধতা ও দেবতার বিরাগ হয়ে উঠবার কারণে শেষতক পুরুষকে বলতে শুনি : "কি আপদ! আমি রমণীকে (এ ভূতের বোঝা) রাখিতেও চাহি না, ফেলিতেও পারি না।" গোটা সংলাপের সূত্র বিচারে রোকেয়ার মন্তব্য হলো — "তদবধি নারী অভিশাপরূপে পুরুষের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে!!!" *(রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬, 'নারী-সৃষ্টি': ১৪২)। ইউরোপীয় তাত্ত্বিক আমাদের প্রাচ্যের গল্পের যে যুক্তিহীন পরিণতির কথা আলোচনায় টেনেছেন, রোকেয়া তার ভেতরের খোলসটি ধরিয়ে দিয়েছেন। 'নারী-সৃষ্টি' নিবন্ধের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা যেতে পারে :

এক. রোকেয়া পশ্চিমা/ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ভারততত্ত্ববিদদের সম্পর্কে জানতেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ও বিশ্লেষণ নিবিড়ভাবে পাঠ করেছেন।

দুই. ইঙ্গারসোল নারী-সৃষ্টি বিষয়ক পৌরাণিক কথা ও গল্পে মজা পেয়েছেন। কিন্তু, এ গল্পের খোলসের ভেতরে যা রয়েছে, তা তিনি বুঝতে পারেননি। উক্ত পুরাণকথার

সংস্কৃতি থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদক মি. বেন-এর অনুবাদ নিয়ে রোকেয়ার পর্যবেক্ষণ লক্ষণীয়। স্বপ্নে ত্বষ্টি লেখিকাকে বলছেন,

> "শুন বৎস! আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বষ্টি। তুমি আমার নারী সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিতেছ দেখিয়া সুখী হইলাম। আমি সর্ব্বশুদ্ধ তেত্রিশটি উপাদানে নারী রচনা করিয়াছি। ইংরাজ লিপিকার মিঃ বেন এই উপকথা সংস্কৃত হইতে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিবার সময় ভ্রম ক্রমে ১২টি উপকরণেরর নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১৪১)।

এর মানে হলো ইউরোপীয়, তথা পশ্চিমা বিশ্ব প্রাচ্য নিয়ে যে পঠন-পাঠন করছে, তাতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেই পাঠ কোনোক্রমেই পরিপূর্ণ নয়।

তিন. রোকেয়ার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার প্রখরতাও প্রতীয়মান হয়। পৌরাণিক গল্প ও কথা নিবিড়ভাবে পাঠ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের পুরাণ, সাহিত্য ও ভাবনা কোনো-না-কোনোভাবে নারীকে গলগ্রহ পাত্রে পরিণত করেছে। সৃষ্টিদেবতা ত্বষ্টি যেন পুরুষেরই স্বার্থ সংরক্ষণের অভিভাবকে পরিণত হয়েছেন। সে কারণে সৃষ্টি নিয়ে যে গল্প ফাঁদা হয়েছে, তাতে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে অহেতুক, পুরুষের বিরক্তি ও কষ্টের কারণ হিসেবে। আবার, নারীকে দেখানো হয়েছে এভাবে :

> "প্রাণ-মনহীন, বুদ্ধি-বিবেকহীন একটা কাঠের পুতুল বিশেষ—পুরুষ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সে নিজেকে অপমানিতা বোধ করে নাই, আবার ফিরাইয়া লইতে আসিলেও গৌরব অনুভব করে নাই" (*রোকেয়া রচনাবলী*, ২০০৬ : ১৪২)।

সৃষ্টিদেবতা ত্বষ্টিদেব নারীর ভেতরে তেমনি এক অনুগ্রাহী ও অনুকম্পায় ধন্য মানস সৃষ্টি করে রেখেছেন। ভারতীয় সংস্কৃত পৌরাণিক গল্পে উল্লিখিত এই গল্পে ত্বষ্টিদেব যে নারী সৃষ্টি করেছেন, রোকেয়া তাকে নাম দিয়েছেন "নির্ব্বাক কাঠের পুতুল" হিসেবে। এই কাঠের পুতুল পুরুষের কাঙ্ক্ষিত।

এগার

উপসংহার

পুব ও পশ্চিম —উভয়—জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন রোকেয়া। তিনি *বেদ*, *উপনিষদ*, *গীতা* ও রবীন্দ্রনাথের রচনা যেমন পাঠ করেছেন, তেমনি এর সমান্তরালে পশ্চিমা সাহিত্য নিয়েও অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতায় আমরা সেটা লক্ষ করি। আবার, শেক্সপিয়ার, ইঙ্গারসোল, ম্যারি ক্যারোলি ও উডের মতো ইউরোপীয় লেখক-লেখিকার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো। দুটি ভিন্ন বিশ্বের— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের— চিন্তার মধ্যে রোকেয়া

বিরোধ বা দূরত্ব খুঁজার চেষ্টা করেননি। বরং, তিনি তাদের মাঝে খুঁজেছেন মেলবন্ধনের সূত্র ও উপাদান। এসব সূত্র ও উপাদান খুঁজতে গিয়ে উভয়ের মধ্যে একটি বন্ধনের সেতু নির্মাণের প্রয়াস করেছেন। পশ্চিমকে তিনি সামনে এনেছেন দুটি কারণে : প্রথমত, ইংল্যান্ডের বা ইউরোপের শিক্ষা ও সামাজিক অগ্রগতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানোর জন্য। দ্বিতীয়ত, তাঁদের চিন্তায় যে প্রগতি রয়েছে, প্রগতির সেই ঝাঁজটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে যুক্ত করতে চেয়েছেন। এখানে এসেই তাঁর গ্রহণ ও বর্জনের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গতভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিলো। পশ্চিমের প্রতি তিনি আন-ক্রিটিক্যাল ছিলেন, তা বলা যাবে না। তবে, ভারতবর্ষের চিন্তায় যে উৎকর্ষ ছিলো তার আলো অনুধাবন করার প্রতিও রোকেয়ার আহ্বান ছিলো।

তথ্যনির্দেশিকা

Ahmed, Ali, 1973. [1940]. *Twilight in Delhi*, New Delhi: Oxford University Press.

Augustine, Saint, 1967. *The City of God*, trans. By J. Healey, Everyman’s Library, Aldine Press.

Beauvoir, Simone de. 1996 [1947]. *The Ethics of Ambiguity*. Translated by Bernard Frechtman. New York: Citadel Press, 1996. English translation of *Pour une morale de l’ambiguïté* (Paris: Gallimard, 1947).

Beauvoir, Simone de., 1989[1949]. *The Second Sex*. Translated by H. M. Parshley. New York: Vintage Books. English translation of *Le deuxième sexe* (Paris: Gallimard, 1949).

Best, S. & Kellner, D. 1991. Postmodern Theory: Critical Interrogations. New York: Guilford Press.

Braithwaite, R. B. 1955, *An Empiricist’s View of the Nature of Religious Belief*, Cambridge: Cambridge press.

Brown-Grant, Rosalind, 2003. Christine de Pizan as a Defender of Women, New York : Routledge.

Campanella, T. (2007[1602]). The City of the Sun. New York: Cosimo Classics. (Original work published in 1602).

Chadwick, Whitney., 2002. *Women, Art, and Society*, New York: Thames and Hudson.

Cixous, Hélèn, 1976. *The Laugh of the Medusa, Signs*, Vol. 1, No. 4 (Summer, 1976).

Christine de Pizan, *The Book of the City of Ladies*, trans. Rosalind Bown-Grant (1999), 239.

Corelli, Marie, 1996 [1890]. *Murder of Delicia*, London : Kessinger Publishing.

Davis, J. C. (1981). Utopia and the Ideal Society: A Study of English Utopian Writing 1516-

Falco, M. J.2010. "Introduction: Who Was Mary Wollstonecraft?" in *Feminist Interpretations of Mary Wollstonecraft*, ed. M. J. Falco, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Femia, Joseph V. 1981. Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness and the Revolutionary Process. Oxford: Clarendon Press, 1981.

Felski, Rita,1995. *The Gender of Modernity*, Harvard: Harvard University Press.

Friedan, Betty (1963) The Feminine Mystique, Hasmondsworth: Penguine.

Freud, Sigmund, æThe Uncanny" in *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, ed. James Strachey, Vol. XVII, London : Hogarth, 1953, pp.219-252.

Froebel, F. (1907[1826]). *The Education of Man* (W. N. Hailmann, Trans.) New York: Appleton & Co. (Original work published 1826).

Friedan, Betty (1963) The Feminine Mystique, Hasmondsworth: Penguine.

Hasan, Mahmadul Md, 2015. 'Introducing Rokeya's Plural Feminism: A Comparative Study of Rokeya Sakhawat Hossain's Feminist Writings with those of Mary Wollstonecraft.

Hallowell, John H., 1950. *Main Currents in Modern Political Thought*. New York: Henry Holt and Company.

Hegel, G.W.F.,1970. *Phenomenology of Spirit*, trans. A.V. Miller, Oxford: Clarendon Press.

Hossain, Mrs. R. S., 1931. 'Educational Ideals for the Modern Indian Girl's. *The Mussalman*, Vol. XXV. T. W. Edition. Vol. VII, March 5, 1931. No. 26.

Huxley, Aldous, 1962. *Island*, Londln, Harper Perennial.

Kant, I., 1996. *Critique of Pure Reason*, trans., T.K. Abbott, London : Oxford Press.

Levitas, Ruth, 2010. *The Concept of Utopia*. Bern, (first published in 1990 by Philip Allan) Peter Lang AG, p. 9.

Lorris, Guillaume de and Meun, Jean de, 2009. *The Romance of the Rose*, trans. Frances Horgan, Oxford: Oxford University Press.

Mably, 1776. *De la législation, ou principe des lois*, Amsterdam.

Martineau, Harriet, (2014 [1838]). *How to Observe Morals and Manners* (1 ed.). London: Charles Knight & Co.

McCormick, Samuel, 2005. "The Artistry of Obedience: Kant's Correspondence with the King," *Philosophy and Rhetoric* 38.

McCormick, Samuel, 2015. *Letters to Power: Public Advocacy Without Public Intellectuals*, USA : Penn State University Press.

Miah, Mohammad Moniruzzaman, 2014. "A Feminist Critical Evaluation of How Rokeya Sakhawat Hossain's Language of Protest Deplored Patriarchy and Social Anachronism in the British Bengal", Journal of *Arts and Humanities*, KSA : MIR Centre for Socio-Economic Research, USA.

Mill, John Stuart, 2012 (1869). *The Subjection of Women* (1869 first ed.). London: Longmans, Green, Reader & Dyer.

Millett, Kate, 1970. *Sexual Politics*, 1st edition, Garden City, N.Y.: Doubleday.

Moi, Toril, 1985. Sexual/Textual politics: Feminist Literary Theory (2nd ed. 2002) London and New York: Routledge.

Moi, Toril. 1986. 'Feminist. Female, Feminine' (Edited extraCI$ from 'Feminist Literary Criticism', in MoUnt [. ittrary T Mory, (ed.), London .

More, Thomas, 1965 [1516], *Utopia*, translated by Paul Turner, Penguin Books.

Morelly, 1841. *Code de la nature*, Paris.

Murshid, Ghulam, 1983. *Reluctant Debutante: Response of Bengali Woman to Modernization, 1849-1905*, Sahitya Samsad, Rajshahi University, Rajshahi.

Pizan, Christine de. 1982 [1405]. *The Book of the City of Ladies*, trans. Earl Feffrey Richards New York: Persea Books.

Pizan, Christine de, 1999. *The Book of the City of Ladies*, trans. Rosalind Bown-Grant 239.

Quayum, Mohammad A. 2013. *The Essential Rokeya: Selected Works of Rokeya Sakhawat Hossain* (1880-1932). BRILL: Leiden.

Rawls, John, 1971. *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press.

Sarker, Sonita, 2000. "Larger Than Bengal: Feminism in Rokeya Sakhawat Hossains Sultana's Dream and Global Modernities", *Archiv orientalni*, Oriental Institute, Academy of Sciences, Prag, Vol. 68.

Singer, Peter, [1979]. *Practical Ethics*, 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press.

Tharu, S., & Lalita, K., 1991. *Women Writing in India* : 600 b.c. to the present, Vol. I, New York : The Feminist Press at The City University of New York.

Tristram, H. B. 1895. *Rambles in japan, the Land of the Rising Sun*. With fortyfive illustrations by Edward Whymper, from sketches and photographs, London: The Religious Tract Society.

Wollstonecraft, Marry, 1978 [1992], *A Vindication of The Rights of Woman With Strictures on Political and Moral Subject, 3rd ed, London,*. London: J. Johnson.

Wollstonecraft, Mary, 1787. *Thoughts on the Education of Daughters: With Reflections on Female Conduct, in the more important Duties of Life*, London: Johnson.

Wood, Mrs Henry.1897. Anne Hereford. London: Richard Bentley, *Internet Archive.*

Woolf, Virginia*, 1981 [1929]. A Room of One 's Own*, San Diego: Haracourt.

Zaman, Farzana, et.al. 2016. ‘Women in Virginia Woolf and Begum Rokeya: A View from Western and Islamic Perspective’, *Journal of Humanities and Social Science,* Volume 21, Issue 2, Ver 1 (Feb 2016).

আমিন, সোনিয়া নিশাত, ২০০২. *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (১৮৭৬-১৯৩৯), ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

আলী সৈয়দ এমদাদ এবং সাহিত্য বিশারদ, মুন্‌শী আবদুল করিম, ১৩১২ (বঙ্গব্দ) বিভাগীয় গ্রন্থ সমালোচনা, *মতিচূর* গ্রন্থ, *নবনূর*, ভাদ্র, ১৩১২ গ্রন্থ।

আমিন, সোনিয়া নিশাত, ২০০২. *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (১৮৭৬-১৯৩৯), বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ।

আলী, সৈয়দ এমদাদ এবং সাহিত্য বিশারদ, মুন্‌শী আবদুল করিম ১৩১২. বিভাগীয় গ্রন্থ সমালোচনা, *মতিচূর* গ্রন্থ, *নবনূর*, ভাদ্র।

ইউসফজী, নওশের আলী খান, কার্তিক, ১৩১১. *মতিচূর* গ্রন্থ সমালোচনা, নবনূর।

কাদির, আব্দুল, ২০০৬. *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মুরশিদ, গোলাম, ১৯৯৩. *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শামসুন নাহার মাহমুদ, ‘মুসলিম বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭।

এম. ফাতেমা খানম, সপ্তর্ষি, সেলিনা চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত , ঢাকা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪।

বসু, আর এবং বেদান্তবাগীশ, এ.সি., ১৮৭৩-৭৪, *রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী*, সম্পাদনায়, কলকাতা, আদি ব্রাহ্ম সমাজ।

বেগম, হাসনা, ১৯৯০. *নৈতিকতা সমাজ ও নারী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৮. (সম্পাদিত). ‘ভূমিকার পরিবর্তে’, *রোকেয়া : চিন্তার উত্তরাধিকার*, ঢাকা : রোদেলা প্রকাশনী।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৮, [সম্পাদিত]. ‘ভূমিকার পরিবর্তে’, *রোকেয়া : শিক্ষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও নবজাগরণ*, ঢাকা : রোদেলা প্রকাশনী।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, *শিক্ষাদর্শন : তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশনী।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ,২০১৩. “রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে দার্শনিক উপাদান : প্রসঙ্গ দ্বৈতবাদ, শিক্ষাতত্ত্ব ও বিকল্প আধুনিকতা”, *আই.বি.এস জার্নাল*, সংখ্যা : ২০, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, ২০২২. "আবাসভূমির সন্ধানে দুই তাত্ত্বিক : রোকেয়া ও পিজান", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*।

মাহমুদ, শামসুন নাহার, ১৯৯৬ [১৯৩৭]. *রোকেয়া জীবনী*, সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৬, (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭)।

রউফ, আবদুর, ২০০৬. *রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, বিশ্বকোষ পরিষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, , 'নূর-ইসলাম', মতিচূর দ্বিতীয় খণ্ড।

রফিক, আহমদ, ২০০৬. "নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার নিরলস যোদ্ধা রোকেয়া", *নারী প্রগতির চার অনন্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

হক, মফিদুল,২০০৭. "নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন ও তাঁর ভূমিকা", *নারীমুক্তির পথিকৃৎ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।